Registered

মূল্য ঃ দুই টাকা

এক

''সমস্ত দেশের, বিশেষ করে ভারতবর্ষের ঘটনা সাক্ষ্য দেয় ধর্মই মানুষকে পতিত, দাস, উপেক্ষিত এবং ঘৃণাস্পদে পরিণত করেছে। ভারতীয় মানবতাকে ছিন্ন ভিন্ন করার জন্য কোন কিছুর যদি বেশি নষ্টামি থাকে তবে তা ধর্মের।''

—রাহুল সাংকৃত্যায়ন

গণবার্তা

সূচি..... পৃষ্ঠা

সম্পাদকীয়	১
কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচন..	১
দেশে বিদেশে	২
'দি কলে' প্রকাশিত... প্লেনাম	৩
চিলির রাষ্ট্রপতি নির্বাচন	৪
প্রকৃতি পরিবেশ....রুখবে কে?	৫
কম. অবনী রায়ের স্মরণসভা	৬
সমাজতান্ত্রিক দর্শনবোধ...	৭
রাজ্য বামফ্রন্টের আবেদন	৮

68th Year 40th Issue ★ Kolkata ★ Weekly GANAVARTA ★ Saturday 18th Dec. & 25th Dec. 2021 Joint Issue

সম্পাদকীয়

হিন্দু রাষ্ট্রের প্রকল্পে গণতন্ত্রের ধ্বংসলীলা

মোদী-অমিত শাহ প্রমুখের নেতৃত্বে গণতন্ত্রের পাহারাদার প্রতিটি স্বাধীন ও স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানকে বেপরোয়া ভাবে শুধু বিকৃত করা নয়, একের পর এক দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে ফেলা হচ্ছে। গত সাত বছরে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট, সিবিআই শুধু নয়, বিচার ব্যবস্থার উপরও বিজেপি এবং সংঘ পরিবারের আগ্রাসনের নিত্যনতুন ঘটনা ঘটেছে। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সব স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্তা ব্যক্তিদের শুধু অর্থ, প্রশাসনিক ও আইনসভায় জায়গা করে দেওয়া নয়, প্রয়োজনে ভয়ও দেখানো হচ্ছে। এভাবে এমন বিকৃত সংস্কৃতির আবহে—একাধারে সন্ত্রাস অপরদিকে উৎকোচের মাধ্যমে হিন্দুত্ববাদী ফ্যাসিস্ট মানসিকতার একাধিপত্য সৃষ্টি করা হচ্ছে। এমনই কলুষিত এই মানসিকতা যে, সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি পর্যন্ত নির্লজ্জভাবে জনসমক্ষে বলতে পারেন এবং আত্মজীবনীতে লিখতে পারেন যে, তিনি অযোধ্যার রায় ঘোষণার পর মানসিক চাপ প্রশমন করতে দামী হোটেলে গিয়ে পানাহার করেছেন।

অতি সম্প্রতি সুপ্রীম কোর্টের বর্তমান প্রধান বিচারপতি এই ধরনর নির্লজ্জ রাজনৈতিক প্রভাব সম্বন্ধে যেভাবে বিচারপতি মনোনয়নের ক্ষেত্রে বিচারব্যবস্থার উপর রাজনৈতিক ও অন্যান্য প্রভাব সম্বন্ধে তির্যক মন্তব্য করেছেন, তাতেই বিচারব্যবস্থা সহ অন্যান্য স্বশাসিত সংস্থার অসহায় অবস্থার সাক্ষ্য স্পষ্ট।

সামগ্রিক গণতান্ত্রিক কাঠামোটাতেই পচন ধরছে এবং এই পচনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের মত ভণ্ড-ধর্মনিরপেক্ষ, দুর্বৃত্তভিত্তিক আঞ্চলিক দলও বেপরোয়া ভাবে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের উপর প্রভাব বিস্তার করে বিজেপির গণতন্ত্র ধ্বংস করার কাজটিকেই ত্বরান্বিত করছে। তাই ভারতের গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রতিষ্ঠিত হবার পর নির্লজ্জভাবে যে প্রধানমন্ত্রী সংবিধান দিবস উদ্‌যাপনের বাহ্যাড়ম্বর করেন তিনিই সাত সাতটি দশকের ঐতিহ্য ভেঙ্গে দিয়ে নিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনকে আলোচনার ছলে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে নির্বাচন পরিচালনার পদ্ধতি প্রকরণ সম্বন্ধে নির্দেশ দেন। এমনকি, সংবিধানের গণতান্ত্রিক রীতিনীতির তোয়াক্কা না করে আধার কার্ডের সঙ্গে ভোটার কার্ডের সংযুক্তি করণের আইন সংসদে পাশ করাতেও দ্বিধা করেন না। এক একটি আঘাতেই নির্বাচন কমিশন ও বিচারব্যবস্থার গণতান্ত্রিক কাঠামোটি ধ্বংস করায় হিটলারেই কার্যকলাপের প্রতিচ্ছবি স্পষ্ট।

ইতিপূর্বে কেউ কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছেন যে, গুরু নানকের জন্মদিবসে যে বিজেপি দলের প্রধান মুখ নরেন্দ্র মোদী আবেগ মথিত কণ্ঠস্বরে কৃষি আইন প্রত্যাহার করেন, এক মাস পরে তাঁরই মন্ত্রীসভার কৃষিমন্ত্রী পুনরায় প্রয়োজনে কৃষি আইন বহাল করার কথা ঘোষণা করতে পারেন!

দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি চরম সংকটে। কেন্দ্রীয় সরকার অনবরত মিথ্যা তথ্য দিয়ে জিডিপি বৃদ্ধির গল্প শোনাচ্ছে। অথচ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হার দ্রুত বাড়ছে। লকডাউনে যত মানুষ কর্মহীন হয়েছিল তার অর্ধেক আজও বেকার। ক্রয়ক্ষমতা দ্রুত হ্রাস পাওয়ার ফলে, অসংগঠিত ক্ষুদ্র উৎপাদন ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। অথচ এই সময়ে পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে বিগত বিধানসভার নির্বাচনের মতই প্রচারে ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করছেন প্রধানমন্ত্রী। হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে কাশীর সংস্কারের মাধ্যমে শুধু হিন্দুত্ববাদেরই পরাকাষ্ঠা করছেন না। এরপর মথুরা সহ অন্যান্য অঞ্চলে অযোধ্যার ধরনে সংখ্যালঘুদের লক্ষ করে হিন্দুত্ববাদীদের প্ররোচিত করছেন। বিভিন্ন বিজেপি শাসিত রাজ্যের মতো কর্নাটকেও ধর্মান্তরকরণ আইনের আওতায় বীভৎসভাবে শুধুমাত্র বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করলেও ভিন্ন সম্প্রদায়ের যুগলকে অপরাধী করা হবে।

সুদীর্ঘ একটি বছরেরও বেশি সময়কাল ব্যাপী কৃষক সংগ্রাম মোদীকে বাধ্য করেছে পিছু হঠতে। যেভাবে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশের কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের উপর কৃষি আইন প্রত্যাহারের প্রভাব পড়বে ভেবেছিল বিজেপি বাস্তবে, তা ঘটছে না দেখেই আরও বেশি ধ্বংসাত্মক পথ বেছে নিতে চলেছে। কিন্তু ২০১৯ সালের পর গত দু'বছরে যে ঈশান কোণে কালো মেঘ ঘনিয়ে এসেছে, তা যে কোন চেহারা নিতে যাচ্ছে, তা এ মুহূর্তে ভেবে ওঠা যাচ্ছে না। তবে যত দ্রুত সংঘ পরিবার এই গণতন্ত্র ধ্বংস করার লক্ষ্যে মেতে উঠেছে ভারতের অন্তর্নিহিত বহুত্ববাদী গণতন্ত্রের শক্তি ততই ভিতরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোনো এক বিস্ফোরণের সম্ভাবনায়।

কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচন এক ন্যক্কারজনক গণতন্ত্র ধ্বংসের মলিন উদাহরণ

কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচন প্রায় দু'বছর দেরিতে হলেও হয়েছে। গত ১৯ ডিসেম্বর ভোটগ্রহণ এবং কোনো ওয়ার্ডেই পুনর্নির্বাচনের কোনো সুযোগ বা ব্যবস্থা না রেখেই ২১ ডিসেম্বর সমস্ত কেন্দ্রের ভোট গণনা হয়। লিখতে গেলেও সংকোচ ও বিড়ম্বনার অন্তহীন অনুভূতি হয় যে, নির্বাচনের এই ফলাফলের সঙ্গে কলকাতা মহানগরীর নাগরিকদের মতামতের কোনো প্রকৃত প্রতিফলন হয়েছে বলে আদৌ মেনে নেওয়া যায় না। অসংখ্য যুক্তি সঙ্গত কারণে বলা যায় যে, তৃণমূলী অপশাসনের আরো একটি জঘন্য নমুনা হিসেবে ইতিহাস কলঙ্কিত করে কলকাতা কর্পোরেশনের অবৈধ দখল নিয়েছে মমতা ব্যানার্জীর দল তৃণমূল কংগ্রেস। এই নির্বাচনের নামে প্রহসন সংঘটিত হল রাজ্য সরকারের সাধারণ প্রশাসন এবং পুলিশ প্রশাসনের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। এই প্রহসনমূলক কুনাট্যে দুর্বৃত্ত বাহিনীর যেমন খুশি আচরণ লক্ষণীয়।

প্রকৃত পক্ষে রাজ্য সরকার নিয়োজিত রাজ্য নির্বাচন কমিশন যথারীতি লজ্জাজনক মেরুদণ্ডহীনতার পরিচয় দিয়েছে। রাজ্য ও কলকাতা জেলা বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনার জন্য যে সমস্ত পরামর্শ নানা সময়ে দেওয়া হয়েছিল, সেগুলি সবই নির্বাচন কমিশন যুক্তিহীনভাবে নাকচ করেছে। এমন নগ্নভাবে রিগিং, ছাপ্পাভোট, অনেক ক্ষেত্রে বুথ দখল করা হয়েছে যে, বামপন্থী প্রার্থীদের পরাজয় পূর্ব নির্ধারিত হয়ে পড়েছিল। মমতা ব্যানার্জীর প্রশ্রয় প্রাপ্ত গুণ্ডাবাহিনী ও লুটেরাদের স্বেচ্ছাতন্ত্র চালিয়েও তৃণমূল কংগ্রেস

মার্কসবাদী চিন্তানায়ক
কম. ত্রিদিব চৌধুরী লাল সেলাম।
প্রয়াণ : ২১ ডিসেম্বর ১৯৯৭

১৪৪টি আসন লাভ করতে পারে নি। ১৩৪টি আসনে জয়লাভ করায় অবশ্য কর্পোরেশন পরিচালনায় বিরোধীমুক্ত হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস।

গণতান্ত্রিক রীতিপদ্ধতি মেনে চলার কোনো দায় নেই এই লুম্পেন নির্ভর দলটির। এরা মুখে যাই বলুক, বাস্তবে বারংবার প্রমাণিত হচ্ছে যে, তৃণমূল কংগ্রেস আদপেই একটি গণতান্ত্রিক বোধসম্পন্ন রাজনৈতিক দল নয়। উল্লেখের প্রয়োজন নেই যে, এই দলটি ব্যক্তি মমতা ব্যানার্জীর একটি পরিবারগত সম্পত্তি ও ব্যবসায় হিসেবেই পরিগণিত হয়। এই দলে একজনই তাঁর কোম্পানি কিভাবে চলবে তার নির্দেশ দিয়ে থাকেন। বামপন্থী দলগুলিকে হতমান করতে না পারলে তাঁর স্বৈরতান্ত্রিক আচার আচরণের বিরুদ্ধে জনসাধারণের প্রতিবাদ বিক্ষোভ সংগঠিত হবার সম্ভাবনা থাকে। গণতন্ত্রের পক্ষে দাঁড়িয়ে প্রাতিষ্ঠানিক দুরাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার দায় অন্য কোনো দলের নেই। সুতরাং নির্বাচনী ফলাফলে বামপন্থীরাই মুখ্য শত্রুহিসেবে মমতা ব্যানার্জীর চক্ষুশূল। কর্পোরেশন, পঞ্চায়েত, বিধানসভা, লোকসভা যে কোনো নির্বাচনই হোক্, শাসকদলের মূল উদ্দেশ্য বামপন্থীদের যে কোনো ভাবেই হোক পরাস্ত করা ও হতমান করা। সেই অপকর্ম বাধাহীনভাবে করার লক্ষ্যে কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশিত সি সি ক্যামেরাগুলি পর্যন্ত নানা পন্থায় অকেজো করে রাখা হয়েছিল। বুথের মধ্যে যে গুণ্ডারা তাণ্ডব চালিয়েছিল তা চিহ্নিত করার উপায় আর থাকছে না।

ইদানিংকালে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে কৃষ্ণনগর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত বিধায়ক ও নির্বাচনী ফলাফল ঘোষিত হবার অব্যবহিত পরেই তৃণমূল কংগ্রেসে চলে যাওয়া দলবদলু নেতা মুকুল রায় অনবধনতাবশত একটি কঠোর সত্যবাক্য বলে ফেলেছেন। তিনি বীরভূম জেলার দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা অনুব্রত মণ্ডল বা কেষ্ট মণ্ডলের পাশে দাঁড়িয়েই বলে ফেলেছেন, যাহা বিজেপি তাহাই তৃণমূল কংগ্রেস। পরবর্তীকালে বেফাঁস সত্যি বলার জন্য মুকুল রায়কে অসুস্থ বলে উল্লেখ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। অথচ এমন এক মানসিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তিকেই মমতা ব্যানার্জী বিধানসভায় পাবলিক অ্যাকাউন্টস্ কমিটির চেয়ারম্যান পদে বসিয়েছেন। এই পদটিতে বিরোধী পক্ষের কোনো বিধায়কেরই নিয়োজিত হবার কথা। মুকুল রায়কে বিজেপি'র বিধায়ক হিসেবে দেখিয়ে প্রথা মেনে চলার দাবি করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। সেই তথাকথিত অসুস্থ ব্যক্তিটি পশ্চিমবঙ্গের সবকটি পৌরসভায় বিজেপি'র জয় হবে এমন দাবি

এর পর ৮ পাতায়

নাগরিকদের পছন্দ অনুযায়ী খাদ্য নির্বাচনের অধিকারে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ সমর্থনযোগ্য নয়

গুজরাত রাজ্য প্রশাসনের আমিষ খাদ্য বিক্রয় বা প্রচার বন্ধের নির্দেশনামা সম্প্রতি গুজরাত হাইকোর্ট নাকচ করেছে। আদালত স্পষ্ট ভাষায় রাজ্য সরকারের এই নির্দেশ বা আমিষ খাদ্যের বিরুদ্ধে সরকারি প্রচারের বিরোধিতা করে মন্তব্য করেছে যে আমিষ বা নিরামিষ খাদ্য নির্বাচনের গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর সরকার হস্তক্ষেপ করতে পারে না। নাগরিকদের খাদ্য নির্বাচনের সিদ্ধান্ত আমেদাবাদ মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন গ্রহণ করতে পারে না। বিভেদের রাজনীতির বিরুদ্ধে আদালতের এই সিদ্ধান্ত অভিনন্দনযোগ্য। রাস্তার ২৫ জন হকার আদালতে আবেদন করেছিলেন আমেদাবাদ পৌর কর্তৃপক্ষ আমিষ খাদ্য বিক্রয়ের জন্য তাদের ঠেলা গাড়িগুলি আটক করায় তাদের জীবিকা বন্ধের উপক্রম হয়েছে। আমিষ খাদ্যের বিরুদ্ধে প্রশাসনের প্রচার এবং নির্দেশ তুলে নেওয়ার আবেদন করেছিল—আমিষ খাদ্য বিক্রয়কারীদের হকার গোষ্ঠী।

সম্প্রতি ভারতীয় জনতা পার্টি গুজরাত রাজ্য নেতৃত্ব রাজনৈতিক সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে রাজকোট, ভদোদরা, ভাবনগর এবং আমেদাবাদে খোলা জায়গায় আমিষ খাদ্য বিক্রয়ের বিরুদ্ধে প্রচার এবং প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। খোলা জায়গায় ওমলেট, কাবাব ইত্যাদি আমিষ খাদ্য গ্রহণের দৃশ্য এমনকি ঘৃণিত। কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষদের ধর্মীয় চেতনায় আঘাত হানতে পারে, —এমন উদ্ভট যুক্তিকে মান্যতা দিয়েই নাকি প্রশাসন এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল।

সংকীর্ণ রাজনৈতিক মতলব চরিতার্থ করার লক্ষ্যেই আমিষ খাদ্যের বিরুদ্ধে রাজ্য প্রশাসনের এই নির্দেশ উপভোক্তাদের খাদ্য নির্বাচনের অধিকার লঙ্ঘন করেছে বলে আদালত মন্তব্য করেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আমিষ এবং নিরামিষ ভোজীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির এই রাজনীতি শাসককুলের রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি পক্ষপাতিত্বকেই প্রকট করেছে। গুজরাত বা ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিকাংশ হিন্দুরা নাকি নিরামিষভোজী এমন এক ভ্রান্ত ধারণা ভারতীয় জনতা পার্টি প্রচার করে চলেছে। জান্তব তথ্য কিন্তু অন্য কথাই বলে। Sample Registration System Baseline Survey 2014, অনুযায়ী ৭১ শতাংশ ভারতীয় এবং গুজরাতের ৪০ শতাংশ মানুষ আমিষ খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত।

ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন

এক বছরেরও আগে, ২৬ নভেম্বর, ২০২০ দিল্লী অভিমুখে কৃষক জাঠার মাধ্যমে মোদী সরকারের তিন কৃষি আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল। সম্ভবত শুধু ভারতেই নয়, সারা বিশ্ব ইতিহাসে এই আন্দোলন দীর্ঘতম কৃষক আন্দোলন হিসেবে অভিহিত হয়েছে। সম্প্রতি কৃষকদের এই গৌরবজনক আন্দোলনের অবসান হয়েছে। মোদী সরকার বিতর্কিত আইনগুলি অবশেষে প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছে। প্রশ্ন হল, কেনই বা এই আইনগুলি জারি হয়েছিল? কেনই বা সেগুলি প্রত্যাহার করা হল? কেন্দ্রীয় সরকার এই আইনগুলি নিয়ে সংসদে আলোচনা করতেও গররাজি ছিল।

বিতর্কিত কৃষি আইনগুলির প্রত্যাহারের পাশাপাশি কৃষক সংগঠনগুলির কৃষকদের স্বার্থে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নিশ্চিত করার জন্য কৃষকদের নিয়ে একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাবও মেনে নিয়েছে। স্বামীনাথন কমিশন অনেক দিন আগেই এই ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের ফর্মুলা ঠিক করে দিয়েছিল। কৃষি সংক্রান্ত খরচের সম্পূর্ণ দেড়গুণ। এত দিন পরে নতুন করে কমিটি গঠনের প্রয়োজন ছিল না। তবুও কৃষক সংগঠনগুলি এই প্রস্তাব মেনে নিয়েছে। প্রস্তাবিত কৃষি আইনগুলির মাধ্যমে মোদী সরকারের কৃষিজ পণ্য উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থাকে কর্পোরেট হাঙরদের মুখের গ্রাসে পরিণত করার জঘন্য ষড়যন্ত্র ছিল। এই কৃষি আন্দোলন কৃষিতে কর্পোরেট হানাদারির বিরুদ্ধে পরিচালিত হলেও দেশের অন্যান্য অঞ্চলে আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য সাড়া মেলে নি।

আসলে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশগুলিতে মান্ডি ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে প্রস্তাবিত নয়া কৃষি আইন হরিয়ানা, পশ্চিম উত্তর প্রদেশের কৃষকদের যতটা আতঙ্কিত করেছে, অন্যত্র ততটা প্রভাব ফেলেনি, তাছাড়া বামপন্থী কৃষক সংগঠনগুলির দুর্বলতার কারণেও এই আন্দোলন এক নির্দিষ্ট অঞ্চলেই সীমিত ছিল। মোদী সরকারের কৃষি আইনের ফলে চুক্তি চাষের যে বিপদে কৃষক শ্রেণিকে পড়তে হয়েছে, অত্যাবশ্যক পণ্য আইন তুলে দিয়ে ব্যবসায়ীদের অবাধ লুঠের সুযোগ করে দিয়েছিল, তার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দলগুলির প্রচার এবং ব্যাপক আন্দোলনের অভাব প্রবল ভাবেই অনুভূত হয়েছে। সিঙ্ঘু সীমান্তের আন্দোলন সর্বশ্রেণির কৃষকদের চিরাচরিত জোতদার জমিদার বিরোধী আন্দোলন নয়, এই আন্দোলন ছিল কৃষিতে কর্পোরেট দানবদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে, এবং তাদের বিশ্বস্ত রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনতা পার্টির বিরুদ্ধে। যেহেতু এই আন্দোলন সঙ্ঘ পরিবারের বিরুদ্ধে, আপাতত এই আন্দোলনে বিজয়ী হলেও আগামি দিনগুলিতে এই আন্দোলনের প্রসারের উপর এর ভবিষ্যত নির্ভর করবে এবং সেই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করতে হবে বামপন্থী সংগঠনগুলিকেই।

আন্দোলন শেষে কৃষকরা ঘরে ফিরে গেছেন, এদিকে নির্বাচন দরজায় কড়া নাড়ছে। অযোধ্যার পর কাশী-মথুরাতে সাম্প্রদায়িক রণহুঙ্কার শোনা যাচ্ছে। কৃষকদের অর্থনৈতিক সংগ্রাম রাজনৈতিক সংগ্রামে রূপান্তরিত হলেই বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের পাঁচিল গড়ে উঠতে পারে এমন আশা করা যেতেই পারে।

ক্রেমলিন : রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং চিনের প্রেসিডেন্ট জি জিন পিং-এর মধ্যে ১৫ ডিসেম্বর ভিডিও বৈঠক

একদিকে ইউক্রেন সীমান্তে রুশ সেনাবাহিনীর বিপুল সমাবেশের বিরুদ্ধে আমেরিকা এবং ন্যাটোর রণহুঙ্কার অপর দিকে চিনে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে পশ্চিমী দেশগুলির অভিযোগ—এই দুই ইস্যুর যথাযথ মোকাবিলা করার জন্য রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন এবং চিনের প্রেসিডেন্ট জি জিন পিং, ১৫ ডিসেম্বর বুধবার এক ভিডিও বৈঠক করেছেন।

রাশিয়া, চিন এবং পশ্চিমী দেশগুলি, আমেরিকার মধ্যে সাম্প্রতিক উত্তেজনা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে এই বৈঠকের বিশেষ গুরুত্ব ছিল। মনে হয় আমেরিকা এবং ন্যাটোর রণহুঙ্কারের প্রতিক্রিয়ায় পুটিন জি'র সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক নির্মাণে বিশেষ আগ্রহী। এই বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠতর করার আলোচনাও হয়েছে। রাশিয়া ও চিনের ঘনিষ্ঠতা নিশ্চিতই আমেরিকার বড্ড মাথা ব্যথার কারণ।

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনকে রক্ষণশীল দলভুক্ত সাংসদদের বিরোধিতার মুখে পড়তে হয়েছে

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনকে তাঁর দলেরই সাংসদদের বিরোধিতার মুখে পড়তে হয়েছে। করোনা ভাইরাসের নতুন ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রন প্রতিরোধকল্পে নয়া বিধি জারির বিরোধিতা করছেন রক্ষণশীল দলের সাংসদরাই। ওমিক্রনের সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য স্বগৃহ থেকে কাজ করা (Work from Home) বাড়ির বাইরে মাস্কের ব্যবহার এবং নির্দিষ্ট কয়েকটি স্থানে প্রবেশের জন্য বিশেষ অনুমতি পত্রের (Covid Pass) প্রস্তাব পার্লামেন্টে গৃহীত হতে চলেছে।

মজার ব্যাপার, করোনা প্রতিরোধে এই প্রস্তাবগুলি অনুমোদনের জন্য রক্ষণশীল সদস্যরা নয়, জনগণকে বিরোধী দলের সদস্যদের সমর্থনের উপরই নির্ভর করতে হয়েছে। দলদাসদের অন্ধ আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল আমাদের দেশের সংসদীয় গণতন্ত্রে এমন পরিস্থিতি প্রায় অকল্পনীয়ই বলা যেতে পারে।

বরিস জনসনেরই দলের সাংসদরা কোভিড সংক্রমণ প্রতিরোধকল্পে সরকারি নির্দেশে জারি বিধিনিষেধগুলিকে যথা, হোটেল রেস্তোরাঁ বা নাইট ক্লাবগুলিতে প্রবেশের জন্য প্রতিষেধক টীকা নেওয়ার শংসাপত্র বা –VE কোভিড পরীক্ষার রিপোর্ট দাখিলের বিধিকে অমানবিক বলেছেন। কোভিড সংক্রান্ত বিধিনিষেধ আরোপের জন্য ভোটাভুটি উলপক্ষে রক্ষণশীল দলের সদস্যরা জনসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। বরিস জনসন ২০১৯-এর নির্বাচনে তাঁর দলকে বিপুল ভোটাধিক্যে জয়ী করার প্রধান কাণ্ডারী হলেও দলের এই সাফল্যকে প্রধানমন্ত্রী জনসন নিজের খেয়ালখুশি মতো ব্যবহার করছেন, দলের সদস্যদের এমনই অভিযোগ। এতদসত্ত্বেও জনসনের ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। কারণ দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মনে করছে, জনসন অনেক বিতর্কিত কর্মসূচি গ্রহণ করলেও, তাঁকে মন্দের ভাল বলা যেতে পারে। যার বিকল্প তুলনায় অনেক অনেক বেশি খারাপ হতে পারে। এদিকে সর্বশেষ খবর—ব্রিটেনে এখন পর্যন্ত ৪,৫০০ জন ওমিক্রন আক্রান্ত রোগীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। ওমিক্রনে আক্রান্ত এক জনের মৃত্যুর খবরও পাওয়া গিয়েছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে এপার বাংলা ওপার বাংলার বাঙালীদের অভিনন্দন জানাচ্ছে

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পঞ্চাশ বছর পূর্তির সময় প্রথমেই বলা প্রয়োজন, পাকিস্তান এবং পশ্চিমী দেশগুলি ও আমেরিকার ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র স্বাধীন হিসাবে বাংলাদেশের ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হওয়াটা শুধু সময়ের অপেক্ষামাত্র। আমেরিকার তৎকালীন বিদেশমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার তো বলেই ফেলেছিলেন যে, বাংলাদেশ বলে দেশটিকে অল্প দিনের মধ্যে বিশ্ব মানচিত্রে খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিদ্বজ্জনদের (?) ভবিষ্যদ্বাণী ভুল প্রমাণিত করে বিগত পঞ্চাশ বছরে অনেক চড়াই উতরাই অতিক্রম করে বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে তার সবল অস্তিত্বই শুধু প্রমাণ করে নি, দ্রুত উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে আন্তর্জাতিক মর্যাদা আদায় করে নিয়েছে।

বাংলাদেশ প্রাক্তন প্রভু রাষ্ট্র পাকিস্তানের মত হিংসা, ধর্মান্ধতা সামরিক আধিপত্য কায়েমের পথে না গিয়ে কিছু সাময়িক বিচ্যুতি সত্ত্বেও মোটের উপর শান্তিপ্রিয় দেশ হিসাবে আইনের শাসন বজায় রেখে এগিয়ে যেতে পেরেছে। মৌলবাদের অভ্যুত্থান এবং সন্ত্রাসবাদের কালিমা এই দেশটাকে পুরোপুরি বিভ্রান্ত করতে পারে নি, অভ্যন্তরীণ সুস্থিতি বজায় রাখতে পেরেছে। ভারত সহ অন্যান্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার ফলে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় না বাড়িয়ে জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণে সাফল্য অর্জনের পথে এগিয়ে চলেছে। পাকিস্তানের অন্তর্গত হতদরিদ্র, ব্যাধিজর্জর এক অক্ষম অর্থনীতির অঞ্চল আপেক্ষিক বিচারে আজ পাকিস্তানকে ছাড়িয়ে গেছে। আজকের বাংলাদেশ পাকিস্তানের তুলনায় ৪৫ ভাগ বেশি সম্পন্ন, পাকিস্তানে GDP ২৯৬ বিলিয়ন ডলার, বাংলাদেশের ৪০৯ বিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশের পণ্য পরিষেবার পরিমাণ ৩৮ বিলিয়ন ডলার, পাকিস্তানের ২৬ বিলিয়ন ডলার, বাংলাদেশ নয়, পাকিস্তানই আজ ব্যর্থ রাষ্ট্র।

বাংলাদেশ তার সীমিত আয়ের উল্লেখযোগ্য অংশ শিক্ষায় (১১ শতাংশ) স্বাস্থ্য পরিষেবা ৪ শতাংশ ব্যয় করছে। প্রতিরক্ষা খাতে তার ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ ৯ শতাংশ মাত্র যেখানে পাকিস্তানের ১৮ শতাংশ।

বাংলাদেশের উদীয়মান উদ্যোগপতিরা বিশ্ববাজারে পোষাক রপ্তানি ছাড়াও ওষুধ, বিদ্যুৎ, ব্যাঙ্কিং এবং প্রযুক্তির নানা ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় অগ্রগতি সম্ভব করেছে।

পশ্চিমবঙ্গ এবং ব্রিটিশ ভারতের এককালীন রাজধানী কলকাতা একদা ভারতের সবচেয়ে অগ্রবর্তী এবং সমৃদ্ধ অঞ্চল ছিল। এই বাংলার সেই সোনার দিনগুলি আজ স্মৃতি মাত্র। যে "বাঙালদের" একদা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা হত, তাঁরা আজ মাথা পিছু আয়ের নিরিখে এপার বাংলাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে। ধর্মীয় পরিচয়ে নয়, বাঙ্গালী মুসলমান হিসাবে নয়, 'বাঙ্গালী' হিসাবেই এবং বাঙ্গালীদের দেশ বাংলাদেশ বিশ্বে স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে। হাজার বাধা বিপত্তির মধ্যেও আজকের বাংলাদেশ বিশ্বের এক দ্রুত উন্নয়নশীল দেশ। অনেকেই মনে করেন যে, সোনার বাংলা বা রূপসী বাংলা সব দিক থেকে আগামি দিনে এক সফল ও সার্থক দেশ হয়ে কবিদের স্বপ্ন পূরণ করতে পারে। সেই বাঙালদের দেশকে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে কুর্নিশ।

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে : ‘দি কলে’ প্রকাশিত সাংগঠনিক প্লেনাম

[১৯৮৫ সালের ৬ থেকে ৯ নভেম্বর পর্যন্ত আলিপুরদুয়ারে আরএসপির প্লেনাম অনুষ্ঠিত হয়। প্লেনামটি মূলত ১৯৮৩ সালের কেরালার কুইলনে অনুষ্ঠিত দ্বাদশ জাতীয় সম্মেলনের পরিপূরক। কুইলনের সম্মেলনে সময়ের অভাবের জন্য সাংগঠনিক বিষয় এবং সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলি বিশদ আলোচনা করা সম্ভব হয়নি। তাই আলিপুরদুয়ারের প্লেনাম মূলত সাংগঠনিক আলোচনা এবং নির্দিষ্ট কর্মসূচিসহ বিভিন্ন গণসংগঠনের বাস্তব অবস্থা ইত্যাদি আলোচনার জন্যই আহূত হয়েছিল।

১৯৮৫ সালের ‘দি কল’ পত্রিকার নভেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যায় সেই সাংগঠনিক প্লেনাম-এর বিশদ আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। মূলত সংগঠন বিষয়ক আলোচনা হলেও সেই সময় দেশের এবং রাজ্যের পরপর কয়টি রাজনৈতিক ঘটনা ঘটে যাচ্ছিল। পাঞ্জাব ও অসমের বিভিন্ন রাজনৈতিক টানাপোড়েনের কাহিনি, অমৃতসর, গুরুদ্বারে ব্লুস্টার অপারেশন, শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর হত্যা, লোকসভা-বিধানসভা নির্বাচন এবং অবশেষে রাজীব গান্ধীর প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হওয়া ইত্যাদি ঘটনা দুটি বছরের মধ্যে দ্রুত ঘটেছিল।

সেদিনের ‘দি কল’ পত্রিকার সংবাদ পরিবেশনে একথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল যে, সাংগঠনিক রিপোর্টে দলীয় সদস্যদের সভ্যপদ-এর স্তর সম্পর্কিত সংবিধান সংশোধন এবং বিভিন্ন গণসংগঠনকে কিভাবে শক্তিশালী করা যায় সেই বিষয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছিল।

আজ থেকে প্রায় চার দশক আগে সংগঠন সংক্রান্ত যেসব আলোচনা হয়েছিল এখনো তার প্রাসঙ্গিকতা তো হ্রাস পায়নি বরং পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিবেশেও সংগঠন সংক্রান্ত আলোচনা আরও গভীরভাবে করা প্রয়োজন। সেই প্রয়োজনীয় কথা ভেবেই আমরা প্লেনামে আলোচিত সাংগঠনিক বিষয়-গুলো ‘দি কল’ পত্রিকা থেকে পুনরায় গণবার্তায় পাঠকদের কাছে পরিবেশন করা একান্ত প্রয়োজন বোধ করছি।

—গণবার্তা, সম্পাদকমণ্ডলী]

‘‘দলের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে প্লেনামের প্রেসিডিয়ামের সদস্য কমরেড সৌরিন ভট্টাচার্য প্রথমে সাংগঠনিক রিপোর্টে লিখিত দল এবং বিভিন্ন গণসংগঠনগুলির প্রধান প্রধান দুর্বলতার বিষয়গুলি প্রতিনিধিদের কাছে উপস্থাপন করেন। রিপোর্টে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন ইউ টি ইউ সি, কৃষক সংগঠন এ আই ইউ কে এস, যুব সংগঠন আর ওয়াই ও এবং পি ওয়াই এফ, ছাত্র সংগঠন পি এস ইউ এবং মহিলা সংগঠন, সহ সাংস্কৃতিক সংগঠন ইত্যাদি প্রতিটি গণসংগঠনের জন্য বিশেষ বিশেষ সাংগঠনিক পরিকল্পনার কর্মসূচি উপস্থাপিত হয়েছে। এছাড়াও সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট এবং পার্টি হেডকোয়ার্টারের বিষয়, কেন্দ্রীয় দলীয় মুখপত্র ও বিভিন্ন রাজ্যের দলীয় পত্রিকা গণবার্তা এবং প্রবাহ ছাড়াও একটি কেন্দ্রীয় হিন্দি পত্রিকা প্রকাশের সমস্যাগুলি আলোচনা করা হয়েছিল।

রিপোর্টে নির্দ্বিধায় স্বীকার করা হয়েছে অবিলম্বে দলীয় আদর্শ এবং রাজনৈতিক প্রশিক্ষণের দুর্বলতাগুলো কাটিয়ে ওঠা সর্বাপেক্ষা বেশি করে প্রয়োজন। এছাড়া বিভিন্ন স্তরে সাংগঠনিক রিপোর্ট পরিবেশন এবং মার্কসবাদী-লেনিনবাদী স্টাডি কোর্স নির্ধারণ করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যার মাধ্যমে গণসংগঠনগুলি এবং পত্রিকার মাধ্যমে সাধারণ সদস্যদের কাছে বিশদ আলোচনা ও বার্তা পৌঁছানো প্রয়োজন। রিপোর্টের শেষ অনুচ্ছেদে সাধারণ বিষয়গুলি এবং সাংগঠনিক দুর্বলতা এবং ঘাটতিগুলি বিশ্লেষণ এবং সংগঠনের মান তথা শক্তি পরিমাপ করার প্রসঙ্গগুলি নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

অবশ্যই সারা দেশের পরিপ্রেক্ষিতে সামগ্রিক বাম আন্দোলন বিশেষ করে স্বাধীনতা-উত্তর পর্যায়ে সি পি আই, সি পি আই (এম) প্রভৃতি বিভিন্ন কম্যুনিস্ট পার্টি এবং বাম দলগুলির দুর্বলতা সমূহ আলোচনা করা হয়েছে। তাই বলে নিজেদের দলের দুর্বলতা বিচ্যুতি এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অধ্যয়ন তথা অনুশীলনের প্রক্রিয়ার খামতিগুলি কখনো ছোট করে দেখা উচিত নয়। এটাই কঠিন বাস্তবতা যে বামপন্থী দলগুলোর কিছুটা গণভিত্তি কেরালা, ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গে বিস্তৃত হয়েছে। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই গণভিত্তি বিচার করা হয়েছে বিভিন্ন নির্বাচনে মতদাতাদের ভোটের ভিত্তিতে। কার্যত হিন্দিভাষী অঞ্চলে এবং উত্তর-পূর্ব ভারতে বামপন্থীদের যেভাবে প্রভাব বিস্তার করা উচিত ছিল তা এখনো স্বাধীনতার চার দশক পরেও সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এটাই কঠিন এবং কঠোর বাস্তবতা যে আর এস পি সহ বামদলগুলোকে ধৈর্য ধরে কঠিন পরিশ্রম করে বৈপ্লবিক দৃঢ়তা এবং আদর্শকে সম্বল করে এখনও বহু পথ ধৈর্য সহ অনেক দীর্ঘ সময় ধরে চলতে হবে।

ইতিমধ্যে এই রিপোর্টে পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকারের শরিকরূপে চলতে গিয়ে সীমিত প্রশাসনিক ক্ষমতাকে সংগ্রামের হাতিয়াররূপে ব্যবহার করা এবং বৃহত্তর গণসংগ্রাম এবং শ্রেণি সংগ্রাম গড়ে তুলে কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত কংগ্রেস-পুঁজিপতি শ্রেণির শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোনো শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তোলা যায়নি।

আশু সাংগঠনিক দায়বদ্ধতা এবং এগারো দফা কর্মসূচি :

চূড়ান্ত পর্যায়ে কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে বিশেষ সম্মেলনে উপস্থিত সদস্যদের কাছে আরও সাংগঠনিক দায়বদ্ধতা এর পরিপ্রেক্ষিতে এগারো দফা কর্মসূচি উপস্থাপিত করা হয়েছে।

(১) কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীকে শক্তিশালী করে পুনর্গঠন করা এবং অতিরিক্ত দায়িত্বশীল কমরেডদের নিযুক্ত করে কেন্দ্রীয় কমিটির কাজকর্ম চালানো প্রয়োজন।

(২) দ্বিতীয়ত ‘দি কল’ পত্রিকাকে সারাদেশের প্রেক্ষিতে একটি নিয়মিত মাসিক পত্রিকা রূপে প্রকাশ ও প্রচার করতে হবে।

(৩) একটি নিয়মিত মাসিক অন্তর্দলীয় পত্রিকা অবিলম্বে প্রকাশ এবং ব্যাপক প্রচার করতে হবে।

(৪) লোকাল থেকে জেলা, জেলা থেকে রাজ্য, রাজ্য থেকে কেন্দ্র অর্থাৎ উপর থেকে নিচে এবং প্রয়োজনীয় ভাবে নিচের থেকে উপরে রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক রিপোর্টিং ব্যবস্থাকে অবিলম্বে গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। মনে রাখতে হবে এই পদ্ধতি একাধারে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার অনুশীলন এবং অপরদিকে সংগঠনের সর্বস্তরের মধ্যে সুস্থ সাংগঠনিক সম্পর্ক গড়ে তোলে।

(৫) পার্টির বিভিন্ন স্তরের মধ্যে অর্থাৎ, নেতৃত্ব এবং কর্মীদের মধ্যে নিয়মিত সাংগঠনিক পর্যালোচনা এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পাশাপাশি বিভিন্ন এলাকার জনসাধারণ এবং খেটেখাওয়া মানুষের সঙ্গে দলীয় কর্মীদের যোগাযোগের সম্পর্কটাকে বজায় রাখতেই হবে।

(৬) সর্বাধিক গুরুত্বের সঙ্গে দল এবং সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ এবং তর্কবিতর্কের নিয়মিত পরিচালনার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৭) মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ভিত্তিক সর্বাধুনিক আর্থ রাজনৈতিক পরিস্থিতি নির্ভর স্টাডি কোর্স প্রস্তুত করতে হবে। মাঝে মাঝেই লিফলেট এবং পুস্তিকার মাধ্যমে তাৎক্ষণিক আর্থ রাজনৈতিক বিষয়গুলি তুলে ধরা এবং বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের মধ্যে এই সব পত্রিকাগুলি পাঠ করে নিয়মিত প্রচার করতে হবে।

(৮) ইউ টি ইউ সি, কেন্দ্রীয় হেডকোয়ার্টারের কাজকর্মে দক্ষতা এবং নিয়মানুবর্তিতা বৃদ্ধি করতে হবে যাতে জাতীয় স্তরে ন্যাশনাল ক্যাম্পেন কমিটি এবং কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের সঙ্গে যৌথ সংগ্রামের পরিসরে নিজেদের সংগঠনের শক্তি সর্বভারতীয় স্তরে সাক্ষর রাখতে পারে।

(৯) অবিলম্বে এ আই ইউ কে এসের সর্বভারতীয় স্তরে সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তুলে শক্তিশালী সংগঠনে উন্নীত করতে হবে।

(১০) পি এস ইউ, আর ওয়াই ও (আর ওয়াই এফ), পি ওয়াই এফ-কে সর্বভারতীয় সংগঠনে পরিণত করতে হবে।

(১১) রাজ্যস্তরে উপরোক্ত কর্মসূচিগুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং আগামী এক বছরের মধ্যে আমাদের কর্মসূচি কতটা এগুলো সে বিষয়ে তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ করতে হবে।

এরপর ৮ এবং ৯ নভেম্বর প্রতিনিধিবৃন্দ সম্পাদকমণ্ডলীর দ্বারা প্রদত্ত কর্মসূচি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেন এবং সাংগঠনিক রিপোর্টে ট্রেড ইউনিয়ন এবং গণসংগঠন বিষয়ক আরও কিছু নতুন তথ্য সংযোজন করার লক্ষে সংশোধনী দেন।

দলের এবং ইউ টি ইউ সির কেন্দ্রীয় অফিস এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক কাঠামো সহ দায়িত্বশীল নেতৃত্ব কেন্দ্রীয় অফিস পরিচালনার ওপর প্রত্যেক প্রতিনিধি যথেষ্ট গুরুত্ব দেন। বিশেষ প্লেনামে প্রস্তাবিত সংবিধান সংশোধনের বিষয়ে বিশদ আলোচনা সম্ভব হয়নি। সিদ্ধান্ত হয়েছে আগামী কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনে আলোচনার ভিত্তিতে সংশোধনের প্রস্তাব সাধারণ সদস্যদের সামনে উপস্থাপিত করা হবে।

সাধারণ সম্পাদকের ভাষণ এবং সংগঠনকে শক্তিশালী করার আহ্বান:

সাধারণ সম্পাদক এই সাংগঠনিক বিশেষ সম্মেলন বা প্লেনামের যথাযথ গুরুত্বের বিষয়টি উপস্থিত প্রতিনিধিদের কাছে ব্যাখ্যা করেন। তিনি লেনিনের বক্তব্য থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, বিপ্লবী তত্ত্ব ব্যতীত বিপ্লবী দল গঠন করা সম্ভব নয়। বিপ্লবী তত্ত্ব কার্যকর করতে গেলে সুদৃঢ় সাংগঠনিক বাধনসম্পন্ন এবং সুশৃঙ্খল মার্কসবাদী আদর্শ নির্ভর সচেতন বিপ্লবী কর্মী প্রয়োজন। তাই একথাও ঠিক যে বিপ্লবী দল ছাড়া বিপ্লব সংগঠিত করা সম্ভব নয়। লেনিন তার বিখ্যাত বিপ্লবী দল গঠন সংক্রান্ত পুস্তক ‘হোয়াট ইজ টু বি ডান’-এ বারবার জোর দিয়ে এই কথাই বলেছেন যে সমাজ বদলের সুতীব্র ইচ্ছা শক্তি সম্পন্ন সচেতন বিপ্লবীদের দল গঠনের মাধ্যমেই রাশিয়ার বিপ্লবের পথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব।

সাধারণ সম্পাদক আমাদের দেশের আর্থ রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন বিগত চার দশক ধরে সংসদীয় গণতন্ত্রের কাঠামোটি ব্যবহার করে এদেশে পুঁজিপতি শ্রেণির শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত। আর এস পি সহ বিভিন্ন মার্কসবাদী বামপন্থী দলগুলো এখনো পর্যন্ত এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উৎখাতের মতো সাংগঠনিক প্রস্তুতি নিতে পারেনি।

নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, দীর্ঘস্থায়ী গণসংগ্রাম এবং শ্রেণি সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় সংগঠন নির্মাণ করে এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উৎখাত করে অন্তর্বর্তীকালীন সর্বহারা শ্রেণির শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। যদিও পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ক্রমাগত একের পর এক আর্থ-রাজনৈতিক সংকটের মধ্য দিয় অতিক্রম করছে, তবুও আমরা এখনও নিশ্চিত করে বলতে পারি না কবে সেই প্রয়োজনীয় সংগঠন গড়ে তুলে সর্বহারা শ্রেণির নেতৃত্বে এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উৎখাত করা সম্ভব হবে। সুতরাং আর এস পি’র দলীয় সংগঠনকে যথাযথ গুরুত্ব সহকারে গণসংগঠনগুলিকে শক্তিশালী করে সুদীর্ঘ সময়ব্যাপী বৈপ্লবিক সংগ্রামের পক্ষে এগিয়ে যেতে হবে।

চার দশক আগে সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা ১৯৪২-এর আগস্ট বিপ্লব, দেশের বাইরে থেকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এবং আই এন এ-র সশস্ত্র সংগ্রাম এবং দেশের শ্রমিক-কৃষক সহ ভারতবাসীর উত্তাল গণসংগ্রামের ধাক্কায় দেশের শাসনব্যবস্থা থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিজেদের শাসন প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছিল। স্বাধীনতার পরে আমাদের নতুন ব্যবস্থা নতুন শত্রুর বিরুদ্ধে খেটে খাওয়া মানুষের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হচ্ছে। বিপ্লবী কর্মীদের যথাসাধ্য পরিশ্রম করে কারখানায় শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে, ক্ষেতেখামারে কৃষক এবং ক্ষেতমজুর এর মধ্যে এবং বঞ্চিত সাধারণ মানুষের মধ্যে সংগঠন বাড়িয়ে তোলার কাজ ছাড়া বিপ্লবী দল গঠন সম্ভব নয়।

চার দশক পার হয়ে গেছে স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছেন প্রাকৃতিক কারণে তাদের অভাবে দলের মধ্যে শূন্যতা তৈরি হয়েছে। সুতরাং সাধারণ সম্পাদকের আহ্বান নতুন প্রজন্ম এবং খেটেখাওয়া শ্রেণির কর্মীদের দলের কাজে এবং গণআন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে আসা ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প নেই।

সাধারণ সম্পাদক আশা প্রকাশ করেন এভাবেই সংগঠন এবং আন্দোলন গড়ে তোলার কাজ ধৈর্য ধরে সাহসের সঙ্গে মার্কসবাদী আদর্শে চালিয়ে যেতে পারলে সর্বহারা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পতাকা প্রবীণ কমরেডদের হাত থেকে নতুন প্রজন্মের হাতে উত্তোলিত হবে। তিনি আলিপুরদুয়ারেরর এই ঐতিহাসিক সম্মেলনের বার্তা সম্মেলনের প্রতিনিধি সহ প্রতিটি দলীয় কর্মীর কাছে সুগভীর আবেগ নিয়ে ব্যক্ত করলেন।

চিলির রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বামপন্থী প্রার্থী গ্যাব্রিয়েল বোরিক-এর বিপুল জয়

গত ১২ ডিসেম্বর ২০২১ দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণতম রাষ্ট্র চিলির সাধারণ নির্বাচনে ঐতিহাসিক জয় হল একদা বামপন্থী ছাত্রনেতা ও ওই দেশের বর্তমান বামপন্থী আন্দোলনের অন্যতম নেতা কমরেড গ্যাব্রিয়েল বোরিক-এর। মাত্র পঁয়ত্রিশ বছরের যুবক বোরিক নির্বাচনী প্রচারে উত্তর থেকে দক্ষিণ সর্বত্র ঘুরেছেন, প্রভূত পরিশ্রম করেছেন এব বর্তমান প্রজন্ম বা সর্বস্তরের যুবক যুবতীদের কাছে চিলি'র দারিদ্র, বঞ্চনা, বেকারত্ব এবং ভয়াবহ শ্রেণিবৈষম্য প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী সংগ্রামের কথা বলেছেন। তিনি প্রায় সব নির্বাচনী সভাতেই অভিযোগ করেছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বিশেষ করে সেদেশের বিশালাকার বা দৈত্যাকৃতি বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলি লাগাতার শোষণে দীর্ণ করেছে চিলির জনসমাজকে। তিনি সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক গণআন্দোলনের প্রসঙ্গ তুলেছেন। চিলির বিশ্বখ্যাত তামা খনিগুলি যেভাবে বহুজাতিক কোম্পানিগুলির কুক্ষিগত হয়ে পড়েছে এবং এসবগুলির মাধ্যমে বিপুল অর্থ রোজগার করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর চূড়ান্তভাবে চিলির পরিবেশ ও প্রকৃতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে। তার উল্লেখ করেছেন। দেশের সাধারণ মানুষের দুর্দশা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে বলে তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত।

গ্যাব্রিয়েল বোরিক ছাপ্পান্ন শতাংশেরও বেশি ভোটে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবল দক্ষিণপন্থী প্রার্থী কর্পোরেট পুঁজির দালাল হোসে অ্যান্টেনিও কাস্তকে হারিয়েছেন। গত নভেম্বরের নির্বাচনে গ্যাব্রিয়েল বোরিক পেয়েছিলেন ২৫.৮ শতাংশ। সেবার কাস্ত পেয়েছিলেন প্রায় ২৮ শতাংশ। ও দেশের নির্বাচন কমিশন এই ফলাফলে সন্তুষ্ট না হয়ে আবার নির্বাচনের ব্যবস্থা করে। এবার বিপুল ভোটে জেতেন বামপন্থী অ্যাপ্রুভ ডিগনিটির প্রার্থী গ্যাব্রিয়েল বোরিক।

এর আগে ১৯৭৩ সালে চিলির প্রথম সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রপতি ডা. সালবাদর আয়েন্দে ওয়াইসেন বা গোসেন কুখ্যাত মার্কিন গুপ্তচর সংগঠন সি আই এ'র প্রণোদনায় সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত হয়েছিলেন। সালবাদর আয়েন্দের আদর্শেই অনুপ্রাণিত গ্যাব্রিয়েল বোরিক। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে ডা. আয়েন্দে নির্বাচিত হয়েছিলেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবার অব্যবহিত পরেই সর্বজনীন শিক্ষা প্রসারে বিশেষ তাৎপর্যবাহী পবিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে দ্রুত পদক্ষেপ করেছিলেন। ওই দেশের আদিম জনজাতি মাপুচেন শিশুদের জন্য ৩০০০ স্কলারশিপের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। ওই ইন্ডিয়ান জনজাতির সন্তানদের চিলির সাধারণ জনসমাজে সমান পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এই শিক্ষাবিস্তার প্রকল্প বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। এখন ভাবতেও বেশ বিস্মিত হতে হয় যে, তাঁর রাষ্ট্রপতিত্বের মাত্র এক বছরের মধ্যেই তিনি যত্নের সঙ্গে নির্বাচিত ৫৫০০০ স্বেচ্ছাসেবক যুবক-যুবতীদের মাধ্যমে অক্ষরজ্ঞানহীন শিশুদের শিক্ষালয়ে ফিরিয়ে এনেছিলেন। মূলত দেশের দক্ষিণতম প্রান্তে প্রায় নিরক্ষর মানুষদের প্রাথমিক শিক্ষায় সহায়তা করতে শুরু করেন ডা. আয়েন্দে।

ডা. সালবাদর আয়ন্দে খনি ব্যবসার জাতীয়করণের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। তখনও বিশ্বে নয়া উদারবাদী ব্যবস্থা বর্তমানের মতো জাঁকিয়ে বসেনি। ডা. আয়েন্দের ক্ষমতা

কমরেড গ্যাব্রিয়েল বোরিক

হরণের পরেই আমেরিকায় শিকাগো স্কুলের অর্থনীতিবিদ ফ্রাইডম্যান ও হায়েকের নেতৃত্বে চিলি রাষ্ট্রে নয়া উদারবাদের বাস্তব পরীক্ষা নিরীক্ষার কর্মসূচি বিপুল বেগে বাস্তবায়িত হতে শুরু করে। তাঁদের সহায় চরম স্বৈরতন্ত্রী অত্যাচারী শাসক অগুস্ত পিনোশে। বহুসহস্র চিলিবাসীকে নির্মমভাবে হত্যা করে এবং অত্যাচারের স্টীম রোলার চালিয়ে পিনোশে সরকার মার্কিন মুলুকের বড় বড় ব্যবসায়ীদের প্রভূত সুবিধা করে দেয়। এইসব ব্যবসায়ীদের মুনাফা লুণ্ঠন অস্বাভাবিক গতিতে বেড়েই চলে। নতুন করে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন যে, বিশ্বখ্যাত কবি সাহিত্যিক পাবলো নেরুদাকে পর্যন্ত পিনোশের অপশাসন রেয়াৎ করেনি। তাঁকে গৃহবন্দি করে রেখে বস্তুত হত্যা করে সামরিক স্বৈরতন্ত্রী ব্যবস্থা। নতুন করে আবার এক সালবাদর আয়েন্দের নীতি আদর্শ চিলিতে ফিরে আসছে গ্যাব্রিয়েল বোরিকের নেতৃত্বে। তিনি স্পষ্টভাবে নয়াউদারবাদ বিরোধী বলে ঘোষণা করেছেন।

ডা. আয়েন্দের রাষ্ট্রপতিত্ব মাত্র তিন বছরেরও কম সময়ে চিলির মূল্যস্ফীতি ৩৬.১ শতাংশ থেকে কমে ২১.১ শতাংশ হয়েছিল। শ্রমিক কর্মচারীদের উপার্জন বৃদ্ধি ঘটেছিল গড়ে ২২.৩ শতাংশ। লক্ষ করা যায় যে অদক্ষ শ্রমিক যারা কায়িক শ্রমের ওপর নির্ভরশীল তাঁদের উপার্জন বেড়েছিল প্রায় ৫৬ শতাংশ। একটু ভাল বা পরিচ্ছন্ন কাজ করা কর্মচারীদেরও আয় বেড়েছিল প্রায় ২৩ শতাংশ হারে। এত বেশি হারে শ্রমিক কর্মচারীদের আয় বা উপার্জন বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে আয়-বৈষম্যও অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভব হচ্ছিল। আরো তাৎপর্যপূর্ণ যে, এসব সত্ত্বেও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব হয় নি। দেশের পুঁজিপতি শ্রেণি যাদের স্বার্থ মার্কিন বহুজাতিক কর্পোরেশনের স্বার্থের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিল তারা প্রমাদ গুণেছিলেন। খাদ্যসামগ্রী বিতরণ, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষাক্ষেত্রে আয়েন্দে সরকারের কঠোর নিয়ন্ত্রণমূলক নীতি বিশেষ উন্নয়নের পথ সুগম করেছিল। চিলির বামপন্থী আন্দোলনের সংগঠকরা বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে ডা. আয়েন্দের ভূমিকা সর্বদাই স্মরণ করেন। নতুন রাষ্ট্রপতি গ্যাব্রিয়েল বোরিক সেই ঐতিহ্যেরই বাহক হবেন বলেই মনে করা হচ্ছে।

ডা. সালবাদর আয়েন্দের সংগ্রামী স্মৃতি চিলির বহু মানুষ যেমন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণে রেখেছে তেমনই মনে রাখতে হবে যে, সেই সময়কালে একমাত্র কিউবা ছাড়া লাতিন আমেরিকার অন্য কোনও দেশেই সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন এমনকি, বামপন্থী আন্দোলনও তেমন বেগবান হয়ে ওঠে নি। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দুর্বার আন্দোলন লাতিন আমেরিকা মহাদেশের উত্তরাংশে সালদিনো সান্দিনিস্তা বা তাঁরও আগে সাইমন বলিভার বা হোসে মার্তির মতো শ্রদ্ধেয় নেতৃবৃন্দ অগ্রচারী ভূমিকায় ছিলেন। ১৯৫৯-এ কিউবায় বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পরেই ফিদেল কাস্ত্রো এবং বিশ্ববিপ্লবী চে গ্যেভারার উজ্জ্বল উদাহরণ অনুসরণ করে ওই মহাদেশের বহু রাষ্ট্রে বামপন্থী আন্দোলন বিশেষ পরিশ্রম ও প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে এগোতে থাকে। একটি অনুকরণীয় সাফল্য অন্য বহু জনকে অনুপ্রাণিত করে। ওই মহাদেশের দক্ষিণের দেশগুলিতে বামপন্থী ধারার রাজনীতির প্রভাব তুলনামূলকভাবে অনেকটা কমই ছিল। বস্তুত চিলি রাষ্ট্রে সালবাদর আয়েন্দেই প্রথম বামপন্থী আন্দোলনের নায়ক। বর্তমান সময়ে দুনিয়া জুড়ে গভীর সংকটে নিমজ্জিত আগ্রাসী পুঁজিবাদের আক্রমণাত্মক ভূমিকার বিপরীতে দাঁড়িয়ে কিছুকাল আগেই পেরুর রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন বামপন্থী কাস্তিল্লো। এবারে চিলির রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন গ্যাব্রিয়েল বোরিক। যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

নয়া উদারবাদী ধনতান্ত্রিক প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নে সংকটাপন্ন পুঁজিবাদ উদগ্রভাবে সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে নগ্ন আক্রমণ চালাচ্ছে। ভারত সহ বিভিন্ন দেশে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বামপন্থী আন্দোলনগুলিকে বানচাল করতে এবং বামপন্থীদের অপ্রাসঙ্গিক করে জনসমাজে হেয় প্রতিপন্ন করার কুৎসিত পরিকল্পনা চলছে। তেমন এক পরিস্থিতিতে চিলির মতো একটি দেশে গ্যাব্রিয়েল বোরিকের বিপুল জয় নতুন পথে ভাবার উৎসাহ সৃষ্টি করবে বলেন মনে হয়।

লেনিনের তত্ত্ব ও অনুশীলনের মূল কথা

লেনিনের সাংগঠনিক চিন্তাধারা ও কার্যকলাপের মধ্যে অনেকেই এক ধরনের আধিপত্যবাদের প্রবণতা লক্ষ করেছেন। শুধুমাত্র আর এস ডি এল পি থেকে ধীরে ধীরে দলটিকে কমিউনিস্ট পার্টিতে বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় নয়, বিপ্লবোত্তর 'যুদ্ধকালীন সাম্যবাদ'-এর হিংসাত্মক রাষ্ট্রিক ক্ষমতা ব্যবহারের ক্ষেত্রে লেনিন এবং রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিকে অজস্রবার এই অপবাদ হজম করতে হয়েছে। কি কারণে এই অপবাদ, তখনকার আর্থরাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতটা কি ছিল সে বিষয়ে আপাতত বিশেষ আলোচনা না করেও লেনিন এবং প্রকৃত অর্থেই তাঁর একজন দার্শনিক উত্তরাধিকারী গ্রামসির 'মানবিকতাবাদ' ও বিপ্লবী দলের সাংগঠনিক কাঠামোর গড়ে তোলার ভাবনাচিন্তার মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়।

গ্রামসি এক জায়গায় খ্রিস্টীয় মানবিকতাবাদের একটি ধারার সঙ্গে ঐক্যমত হয়ে বলেছেন যে, শারীরিক গঠন এবং প্রজাতির পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ মানুষে কোনো বিভেদ নেই। একই প্রক্রিয়ায় আমরা বিভিন্ন সংস্কৃতির আবহে বিকশিত—সারা পৃথিবীর মানুষ একই পরিবারভুক্ত সামাজিক মানুষ।

এককথায় বলা চলে লেনিনের জীবনে অজস্র কঠিন কঠোর ও রক্তাক্ত অভিজ্ঞতার পথে যাত্রা করেও বাস্তব জীবনে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলার দীর্ঘ যাত্রার মূল সুরটি ছিল বিশ্বমানবিকতার সুরে তালে বাঁধা। অসম্ভব অমঙ্গলের মাঝেও কল্যাণের সন্ধান করেছেন লেনিন। লেনিনের ব্যক্তিগত সততা, স্বচ্ছতার সঙ্গে ছিল একধরনের প্রচ্ছন্ন গর্ব, জ্ঞানের এবং বুদ্ধিমত্তার। সেই গর্বে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় উপাদানেরই টানাপোড়েন ছিল। কখনও কখনও অসংখ্য মানুষের (অবশ্যই রাশিয়ায় বলশেভিক পার্টি বা বিপ্লব পরবর্তী কমিউনিস্ট পার্টিকে) যথেষ্ট ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছিল। তবুও যে সুদৃঢ় স্বেচ্ছাসেবিতা প্রসূত তাগিদ লেনিন নিজের অন্তর থেকে অন্যান্য ভ্যানগার্ডদের মধ্যে প্রোথিত করতে পেরেছিলেন, তা একটি পর্যায় পর্যন্ত লেনিনের বৌদ্ধিক চেতনার দ্বারা তাড়িত হয়ে একটি পশ্চাদপদ দেশে শ্রমিক সংখ্যা যথেষ্ট কম হওয়া সত্ত্বেও শ্রমিক শ্রেণিকেই অজস্র সমস্যার বাধা পেরিয়ে একটি রাষ্ট্রের ক্ষমতার পরিসরে পৌঁছে দিতে পেরেছিল। আসলে লেনিনের সুতীব্র ইচ্ছাশক্তিই ছিল তাঁর বিপ্লববাদিতার মূলধন। বিপ্লবের সম্ভাব্যতা, কিভাবে বাস্তবায়িত করার শর্তগুলি পরিণত করা যায় এইদিকেই ছিল তাঁর ভাবনাচিন্তা, ধ্যানজ্ঞান এবং জীবনদর্শন প্রসূত লক্ষ্য।

লেনিনের সামগ্রিক জীবন, জীবনচর্যা, মার্কসীয় দর্শনের বাস্তবপ্রয়োগ, সর্বোপরি একটু একটু করে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলার পদক্ষেপে শ্রমজীবী শ্রেণির রাজনৈতিক সচেতনতাকে বাস্তবিক স্তরে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য পরিণত করার বিষয়টিকে কয়েকটি মুখ্য উপাদানের সূত্রে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। গিওর্গ লুকাকস, পল লে ব্লাঙ্ক, লার্স টি লি, আইজ্যাক ডয়েটশায়াব, এমনকি, লেনিনের বিরোধিতা করেছেন এমন অনেক সোশাল ডেমোক্রাটদের লেনিনের জীবনচর্যা আলোচনার সূত্রে নিম্নলিখিত উপাদানসমূহের সাক্ষ্য পাওয়া সম্ভব।

১। সমাজতন্ত্রের সঙ্গে শ্রমজীবী শ্রেণির সম্পর্ক

শ্রমজীবী শ্রেণি এবং শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের মার্কসবাদী তত্ত্ব ও অনুশীলনের প্রয়োজনীয় আন্তঃসম্পর্ক অনুধাবন করে বাস্তব ক্ষেত্রে তাকে ফলপ্রসূ করার প্রচেষ্টা। তরুণ লেনিনের সাংগঠনিক যাত্রাপথের সূচনাই হয়েছে, পূর্ববর্তী সমাজতান্ত্রিক আদর্শে অনুপ্রাণিত বিভিন্ন গোষ্ঠী ও দলের শ্রমিক আন্দোলন থেকে সমাজতন্ত্রের সম্পর্ককে বিচ্ছিন্ন করার ভ্রান্তিগুলিকে সংশোধনের মাধ্যমে। তিনি স্বতঃস্ফূর্ত গণআন্দোলন এবং শ্রেণি সংগ্রামকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত করে রাজনৈতিক সংগ্রাম ও গণতন্ত্রের পরিসর বৃদ্ধি করে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বাস্তব অনুশীলনের পথ নিজে অনুসরণ করেছেন এবং সমসাময়িক সহ পরবর্তী প্রজন্মের সামনে নিদর্শন স্থাপন করেছেন।

২। শ্রমজীবী শ্রেণির অন্তস্থ বৈচিত্রকে বিশ্লেষণ করে বাস্তব রাজনীতির ভূমিতে স্থাপন

শ্রমজীবী শ্রেণির অন্তঃস্থ বৈচিত্র এবং রাজনৈতিক সচেতনতার ও অভিজ্ঞতার অসমবিকাশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করেছেন লেনিন। শ্রমজীবী শ্রেণির অগ্রসর অংশ যাঁরা বৈপ্লবিক কর্মসূচির ভ্যানগার্ড রূপে গণ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে এবং বিপ্লবী দলের দায়িত্ব নিতে পারেন তাঁদের চিহ্নিত করেছেন। তাছাড়া সাধারণ শ্রমিক যাঁরা, শ্রেণি সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন এবং ভ্যানগার্ড নেতৃত্বের সঙ্গে পা মিলিয়ে সমাজতন্ত্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত, তাঁদের ভূমিকাও পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করেন। তৃতীয় অংশ, শোষিত জনগণের নীচু তলার অধিকাংশ মানুষ।

এই চিহ্নিত করণের প্রক্রিয়া অনুসরণ করেই যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে রাজনৈতিক সংগ্রাম সম্পর্কিত সাহিত্য

এর পর ৬ পাতায়

প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রত্যাঘাত রুখবে কে?

তুষার চক্রবর্তী

পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্র এখন শুধু পরিবেশপ্রেমী ও পরিবেশ আন্দোলনের নেতা কর্মীদের বিষয় নয়। মানব সভ্যতার টিকে থাকা না থাকার সঙ্গে তা এখন জড়িয়ে গেছে। বর্তমান পুঁজিবাদী অর্থনীতির সবচাইতে ভয়ংকর পরিণাম হয়ে উঠেছে প্রকৃতি সংহার। ভেঙ্গে পরা বাস্তুতন্ত্রের প্রত্যাঘাত—মানুষ ও সমগ্র জীবজগতের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলেছে। কিন্তু এ সবের মূল কারণ একচেটিয়া পুঁজির প্রাকৃতিক সম্পদকে দখল করা, পণ্যায়িত করা, প্রদূষণ তৈরী করা, বাস্তুতন্ত্র ভেঙ্গে ফেলা ও উন্নয়নের নাম পণ্যমোহের লাগামহীন বিস্তার। এই চরম সংকট মুহূর্তেও সেই বৃদ্ধি ও বিস্তারের প্রক্রিয়ায়, কোথাও কোনো ইতি টানার লক্ষণ কিন্তু নেই। বরং উচ্চপ্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে শুধু শিল্প নয়, সমাজ নিয়ন্ত্রণের কাজটাও এই সুযোগে দ্রুত কুক্ষিগত করে ফেলা হচ্ছে। এক অদৃশ্য নজরদারি চেপে বসছে দেশে দেশে। গণমাধ্যম ও সংস্কৃতিকে দখল করে মানুষকে যুক্তির পথ থেকে সরিয়ে আবেগ আর অপযুক্তির দিকেই বেশি বেশি ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। তার পাশাপাশি, চতুর্দিকে এখনো দেখা যায়, পরিবেশকে রাজনীতি ও অর্থনীতি থেকে বিযুক্ত করার বিপদজনক প্রবণতা। সমাজতান্ত্রিক বা বামপন্থী শিবিরের নেতাকর্মীরা এই বিষয়গুলি নিয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন এমন বলা যাবে না। টুকরো টুকরো ভাবে তারা এই বিপর্যয় বিষয়ে সরব। রাজনৈতিক কর্মসূচির মূল জায়গায় না রাখলেও, ক্রমশ প্রান্তে তার জন্য একটা জায়গা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, পুঁজিবাদ ও প্রকৃতি এবং পরিবেশের সম্পর্ক নিয়ে যাদের সর্বাগ্রে সরব হবার কথা, অগ্রণী ভূমিকা নেবার কথা, তাদের পক্ষে এইটুকু যথেষ্ট নয়। এ যুগে পুঁজিবাদের স্বরূপ আলোচনায় তাই বিপন্ন গণতন্ত্রের বিপদ নিয়ে যেমন সরব হতে হবে, জনমোহিনী রূপে ফ্যাসিবাদী রাজনীতির নির্বাচনী সাফল্যকে যেমন চ্যালেঞ্জ জানাতে হবে—তেমনি, এমনকি তার চাইতেও বেশি সক্রিয়তা দেখাতে হবে—বিপন্ন বাস্তুতন্ত্রের রক্ষা ও পুঁজিবাদের সঙ্গে আক্রান্ত ধরিত্রীর যোগসূত্র চিহ্নিত করার ওপর।

যেন হয়ে গেছে বহু দেরী

সমাজতান্ত্রিক শিবিরের চেতনা ও কর্মধারায় পরিবেশের অবহেলিত দিকটা লুফে নিতে, তার দুর্বলতাকে ব্যবহার করতে পুঁজিবাদী শিবিরের দেরী হয়নি, দ্বিধাও হয়নি। এটা লজ্জার কথা যে সমাজতান্ত্রিক শিবির থেকে, অথবা বাম রাজনীতির তরফ থেকে নয়, বিশ্ব পুঁজিবাদের সদর দপ্তর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৭০ সালে ২২ এপ্রিল দিনটি ধরিত্রী দিবস হিসাবে, দেশব্যাপী, ছাত্র-যুবদের উদ্যোগে প্রথম পালিত হয়েছিল। এমন ঘটনা পরিবেশ আন্দোলনে এক নতুন জোয়াল আনল। এর দুই দশক পরে শুধু আমেরিকায় নয়, সারা বিশ্বের ১৯২টি দেশে এই দিনটি পালনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। অতঃপর, ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও সম্মেলনে গৃহীত রিও সনদ প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করার সংকল্প মানবজাতির প্রাথমিক কর্তব্য হিসেবে তুলে ধরল। সেই সময় থেকে ২২ এপ্রিল মাতা বসুমতি বা মাতা ধরিত্রী দিবস (Mother Earth Day) হিসেবে রাষ্ট্রসংঘের স্বীকৃতি লাভ করেছে।

মহাবিশ্বে আজ পর্যন্ত কেবলমাত্র একটি গ্রহকেই আমরা জানি যেখানে আবহাওয়া প্রাণের অনুকূল। শিল্প বিপ্লবের পর থেকে পুঁজিবাদের উত্থান সেই আবহাওয়া বদলে ফেলছে। পৃথিবীর বুকে দুই হিমযুগের অন্তর্বর্তী হলসিন যুগের এই সহসা অস্বাভাবিক পরিবর্তনের পর্বকে মানব আধিপত্যের ছুতোয় anthropocene (এনথ্রো-পোসিন) বলে দাগিয়ে দেওয়া হলেও সম্ভবত পুঁজিধর্ষিত এই যুগের প্রকৃত নাম হওয়া উচিত capitalocene (ক্যাপিটালোসিন)।

প্রতি বছর, ২২ এপ্রিলের এই দিনটি উদযাপনের সময় একটি বিষয়কে থিম হিসেবে বিশেষভাবে সামনে আনা হয়। এ বছর ''প্লাস্টিকের ব্যবহারে ইতি টানা'' কেই প্রচার ও আলোচনার কেন্দ্রে রাখা হয়েছে। সারা দুনিয়ায় প্রায় ৮৫০ কোটি টন প্লাস্টিক এখন জমা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের মাথাপিছু ১ টনের বেশি। প্রতি বছর যত প্লাস্টিক তৈরি হয় তার মাত্র ৯ শতাংশ পুনর্ব্যবহার করা হয়, আর ১১ শতাংশ পুড়িয়ে ফেলা হয়, বাকি ৮০ শতাংশ বাস্তুতন্ত্রের শ্বাসরোধ করে। সমুদ্রে প্লাস্টিকের পরিমাণ মাছ ও সামুদ্রিক প্রাণীদের ছাপিয়ে যাচ্ছে। ফলে জলচর জীবেরাও বিপন্ন। মানুষ সহ প্রতিটি জীবের খাদ্য ও স্বাস্থ্যকেও তা বিকৃত করছে। সুতরাং, শুধু ব্যবহার কমানো বা পুনর্ব্যবহার নয়, প্লাস্টিকের উৎপাদন বন্ধ করা ছাড়া এই ক্ষতি রুখবার অন্য কোনো পথ নেই। কিন্তু, একটু লক্ষ করলেই বোঝা যাবে, যে তা না করে, শুধু মানুষের আচার বদলাবার কথা ও পচনশীল প্লাস্টিক তৈরির প্রযুক্তি উদ্ভাবনের কথা বলে শিল্প ও পুঁজির ধ্বংসাত্মক ভূমিকাকে আড়াল করাটাই হয়ে উঠেছে দস্তুর।

পরিবেশ আন্দোলন পুঁজিবাদ বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আরো অনেক বেশি প্রতিবাদী চরিত্র অর্জন না করলে তা মাতা বসুমতীকে কোনোমতেই বাঁচাতে পারবে না।

পরিবেশ সমস্যাকে, দূষণকে শিল্পপতিরা শিল্প ও ''উন্নয়নের'' একটি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বা অনিবার্যতা হিসেবে দেখাতেই অভ্যস্ত। অধিকাংশ বিজ্ঞানীরা বিকল্প বা স্বচ্ছ প্রযুক্তির গবেষণা ও সরকারগুলি জরিমানা নামক শাস্তির নাটক দেখিয়ে সেই পাপে নিজেরা কেন জড়িয়ে পরেন তার উত্তরও মনে হয় আমরা সকলেই জানি।

উন্নয়নের বিভ্রম

উন্নয়নের ছুতোয় জনমত এবং গণতান্ত্রিক অধিকার পদদলিত করা ও পরিবেশ ধ্বংস করাটাই এ যুগে পুঁজিবাদকে নিশ্চিতভাবে চিনিয়ে দেয়। উচ্চপ্রযুক্তি এ কাজে পুঁজিবাদের সবচাইতে কার্যকরী অস্ত্র। মোহময় উচ্চপ্রযুক্তি, উন্নয়নের বিভ্রম তৈরি করে। পরিবেশ সহ যে কোনো সমস্যা মোকাবিলার আশ্বাস যোগায় প্রযুক্তি। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও বিপুল তথ্য ভাণ্ডারকে ব্যবহার করে পুঁজিবাদ এখন অতিমানবিক যন্ত্রমেধা ও কর্মপটু রোবট নির্ভর এক মজুরহীন চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে প্রবেশ করছে।

বিশ্বায়ন ছিল দেশে দেশে মুষ্টিমেয় ধনপতিকে সাময়িক ইজারাদার হিসেবে ব্যবহার করে প্রবল পুঁজিতন্ত্রেরই ব্যাপ্তি এবং গভীরতা অর্জনের একটি কর্মসূচি। প্রকৃতি ও মানব সমাজের বৃহত্তর অংশকে ছিবড়ে করে তা ভাগাড়ে ছুঁড়ে দিতে শুরু করেছে। যা ধাপে ধাপে আরও ব্যাপ্তি অর্জন করবে। কিন্তু, এর বিরুদ্ধে লড়তে গেলে, পুঁজিবাদের এই ভয়ংকর রূপের বিকাশ কিভাবে সম্পন্ন হল সেটাও জানা দরকার।

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে, যুদ্ধোত্তর পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সমাজতন্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে বাধ্য হয়। প্রত্যক্ষ উপনিবেশের কবলমুক্ত গরিব কৃষিপ্রধান দেশগুলির অর্থনৈতিক বিকাশের শান্তিপূর্ণ পথ হিসেবে পুঁজিবাদী অর্থশাস্ত্রীরা তথাকথিত উন্নয়ন অর্থনীতির মডেল সামনে আনেন। পুঁজিবাদী দেশের লগ্নি ও ঋণ নিয়ে দ্রুত শিল্পের পরিকাঠামো তৈরি করেই এই সব দেশ দারিদ্রের চক্কর থেকে মুক্তি পাবে, এই ধরনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। কিন্তু, এই পথে চলতে গিয়ে ঋণের ভারে জর্জরিত সদ্যস্বাধীন এই সব রাষ্ট্র হয় প্রাগ্রসর পুঁজিবাদী দেশের পরোক্ষ উপনিবেশে পরিণত হয়, নতুবা এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া শুরু করে। সুতরাং, প্রথম পর্বের উন্নয়ন অর্থনীতি বা তত্ত্ব হিসেবে প্রয়োগে তেমন স্বীকৃতি পায়। ফলে ৭০ দশকে এই ধারা যেন মরুপথে হারিয়ে যায়। কিন্তু, এই পশ্চাদপসারণ ছিল সাময়িক। নিও ক্ল্যাসিক্যাল রীতির মতো বিজ্ঞানের ছাঁদ রপ্ত করে ৮০'র দশকে উন্নয়ন অর্থনীতি আবার নতুন চেহারায় ফিরে আসে।

দারিদ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের শ্লোগানে যাকে সেই সময় লুফে নেয় নিওলিবারেল পুঁজিবাদ।

সমাজতন্ত্রের ভয়ে পুঁজিবাদী দেশেও শ্রমিক ও পুঁজির মধ্যে আপোষরফার মারফৎ কমিউনিস্ট বিরোধী একধরনের ''নিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদ' কায়েম হয়েছিল। কিন্তু, ৭০ দশক পুঁজিবাদের একের পর এক ক্রমবর্ধমান সংকট ৮০র দশকে আমেরিকা সহ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলিকে তা থেকে বেরিয়ে আসার চাপ তৈরী করল। পুঁজির ওপর যাবতীয় রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া হলো। রাষ্ট্র বন্ধ করে দিল নাগরিক পরিষেবার কাজ। যার পরিণতি হল মুক্ত বাজার এবং নিও লিবারেল অর্থনীতির প্রবল উত্থান। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতন যাকে বিশ্বায়িত হবার সুযোগ দিয়েছিল। পুঁজির তরফ থেকে দেখলে, এই পর্বে তা সংকট কাটিয়ে দুই দশকের বেশি সময় জুড়ে প্রবৃদ্ধির সুযোগ পেল। রাষ্ট্র ও সরকার হয়ে উঠল কর্পোরেট লগ্নিপুঁজির দালাল ও পাহারাদার। বিদেশে কর্পোরেট পুঁজির বিনিয়োগের শর্ত ও গ্যারান্টি ছিল জমি, জল, খনিজ পদার্থ, বিদ্যুৎ ও যাবতীয় পরিকাঠামো বিনিয়োগকারীদের হাতে তুলে দেওয়া।

বিশ্বায়নের নামে এই নিওলিবারেল পুঁজিবাদের আগ্রাসনের দুটি প্রতিক্রিয়া সর্বত্র দেখা দিল। এর পর একটি হল পুঁজি ও বিনিয়োগের বিরুদ্ধে তোলা যাবতীয় প্রতিবাদকে দমন করা। যা করা হচ্ছিল সামরিক বাহিনী ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস দিয়ে। ফলে বিপন্ন হল গণতন্ত্র। এবং, বাস্তুতন্ত্র ও পরিবেশের অপর বিপুল চাপের মুখে এই গ্রহের বাস্তুতন্ত্রের ভাঙ্গন।

নিওলিবারেল পুঁজি খোলস ছেড়ে ফ্যাসিবাদ হিসেবেই এখন মাঠে নামছে

পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে যত সুস্থায়ী বলেই মনে হোক না কেন, নিজের বিকাশের নিয়মেই প্রতি পর্বে একসময়ে সে সংকটের দশায় প্রবেশ করে। একনাগাড়ে ১৯৮০ থেকে ফুলতে থাকা নিও লিবারেল পুঁজিবাদ, ২০০৮ সালে মুখ থুবড়ে পড়ল প্রথমে আমেরিকায়, তারপর সারা দুনিয়ায়। যদিও পুঁজি এখন অনেক বেশি ধনী, সংহত ও কেন্দ্রীভূত, তবু তার বৃদ্ধি ধাক্কা খেয়ে থমকে যায়। যদিও বাস্তুতন্ত্র সমেত এই গ্রহ পুঁজি ও পণ্যে যতটা রূপান্তরিত হয়েছে তা মানব ইতিহাসে ইতিপূর্বে কখনো দেখা যায়নি। প্রযুক্তির দাপটে শিল্প শ্রমিকের সংখ্যা দ্রুত হারে কমছে। দেশে দেশে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হওয়া মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। ঋণের জালে জড়িয়ে কৃষক সহ যাদের একটা বিরাট অংশ নিরুপায় হয়ে আত্মহত্যা করছেন। ছাত্র ও তরুণদের সচেতন অংশ পুঁজিবাদের এই স্বরূপকে চিনে এই মহাপ্রলয়ের জন্যে দায়ী মাত্র ১ শতাংশ পুঁজিবাদী শ্রেণির বিরুদ্ধে ৯৯ শতাংশ মানুষকে নিয়ে শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহ শুরু করে। কিন্তু, পুঁজিবাদের মদতপুষ্ট উগ্র দক্ষিণপন্থী অংশ প্রতিবাদের পরিসর কেড়ে নিয়ে প্রধান রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে উঠে আসছে। আমাদের দেশেও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, আত্মপরিচয়ের রাজনীতি, মেরুকরণ ও বিভাজনের রাজনীতি, তার আড়ালে গুন্ডামি ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের প্রয়োগ নিওলিবারেল যুগের অবসান ও ফ্যাসিবাদী একচেটিয়া পুঁজির অভ্যুত্থানের পূর্বাভাস বলেই মনে হয়।

গণতন্ত্রের মৃত্যুঘন্টা বেজে উঠেছে বিশ্বপুঁজির কেন্দ্র থেকে প্রান্ত সর্বত্র। এই পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থাকে পরিবেশ ধ্বংসের প্রধান কারণ এবং শান্তি ও গণতন্ত্রের প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে চিহ্নিত করা ও প্রতিহত করার ওপর নির্ভর করছে মানব সভ্যতা ও জীবজগতের টিকে থাকা।

আজ থেকে ১৫০ বছর আগে 'দাস ক্যাপিটালের' প্রথম খণ্ডে মেটাবলিক রিফ্ট বা বিপাকীয় ভাঙ্গন-এ দিকে আঙুল তুলে পরিবেশ সমস্যাকে পুঁজিবাদী মতাদর্শ ও প্রক্রিয়ার সমস্যা হিসেবে দেখতে শিখিয়েছিলেন অনন্য দার্শনিক কার্ল মার্কস। পরিবেশ ও ধনতন্ত্রের মধে বৈরিতাপূর্ণ দ্বন্দ্বের সমস্যা গত ১৫০ বছরে মহীরূহের মতো বেড়েছে। মুস্কিল এখানেই যে, মার্কস পুঁজিবাদকে সমাজতন্ত্রের পথে মানব সভ্যতার একটি অন্তর্বর্তী ক্ষণস্থায়ী পর্ব হিসেবেই দেখেছিলেন। কিন্তু, গিরগিটির মতো প্রাণীটি তার রং বদলে টিকেছে ও অভিযোজিত হয়ে আজ এক দানবীয় ব্যবস্থা হিসেবে এই গ্রহের বাস্তুতন্ত্র ছারখার করে দিতে উদ্যত।

প্রাণের অনুকূল সাম্য, মানবতা ও পরিবেশকে টিকিয়ে রাখতে গেলে পুঁজিবাদের মোকাবিলা করতেই হবে। পরিবেশ, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের দাবিতে গড়ে ওঠা প্রায় স্বতঃস্ফূর্ত যে সব আন্দোলন তাদের সামাজিক প্রতিরোধের পরিবর্তিত করাটাই হোক ২০১৮ সালের ২২ এপ্রিলের ধরিত্রী দিবসে আমাদের সম্মিলিত স্বেচ্ছাব্রত।

(সোদপুরের পাঁচ টাকার ডাক্তার নামে সুপরিচিত, দীর্ঘদিনের সমাজবাদী নেতা, জরুরি অবস্থার সময় জেলখাটা, জনতার নয়া সমাচার পত্রিকার সম্পাদক ডক্টর সন্মথনাথ ঘোষ কয়েকদিন আগে প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর অনুরোধে লেখা জনতার নয়া সমাচারে প্রকাশিত একটি লেখা পুনঃপ্রকাশিত করে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।)

লেনিনের তত্ত্ব ও অনুশীলনের মূল কথা

৪-এর পাতার পর

এবং বক্তৃতা বিভিন্ন ধরনে উপস্থাপিত করার বাস্তব অনুশীলনের পদ্ধতিতে দলীয় ভ্যানগার্ডদের প্রশিক্ষিত করার পথ বেছে নিয়েছেন।

৩। **শ্রমিক শ্রেণির রাজনৈতিক স্বাধিকার**

শ্রেণি সংগ্রাম এবং সামাজিক আন্দোলনের উপর উদার গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের প্রভাব মুক্ত করে শ্রমিক শ্রেণির নিজস্ব শ্রেণিগত চেতনাভিত্তিক সংগ্রামের উপর জোর দিয়েছেন লেনিন। তিনি প্রত্যাশা করতেন যে শ্রমিক শ্রেণি নিজেদের বৈপ্লবিক তাগিদেই সংগঠনের শক্তি দশগুণ থেকে একশগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে সমর্থ। এতদিন পর্যন্ত উদারগণতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবীরা শ্রমজীবী শ্রেণির কাছে যে সব দাবিদাওয়া পূরণের প্রতিশ্রুতি দিত, লেনিনের ব্যাখ্যায় তা যেন ছিল নেতৃত্বের পক্ষ থেকে শ্রমিক শ্রেণিকে দানধ্যানের সামগ্রী। সংগঠন ও সমাবেশ করার স্বাধীনতা, নিজেদের শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি প্রসূত পত্রপত্রিকা, পরিপূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধিকার ইত্যাদি গণতান্ত্রিক দাবির ভিত্তিতে শ্রমিক শ্রেণি নিজেদের মধ্যে নিজের শ্রেণির চূড়ান্ত স্বার্থ সম্বন্ধে রাজনৈতিক সচেতনতাকে সম্বল করেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে এগিয়ে যাবে। এবিষয়ে লেনিন শুধু দ্বিধা, মুক্তই ছিলেন না, এই পথকেই একমাত্র পথ বলে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রত্যয়ী ছিলেন।

৪। **সমস্ত ধরনের আর্থসামাজিক শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণির ভূমিকা**

লেনিন অন্যান্য বিপ্লবী কর্মীদের থেকে সমস্ত ধরনের আর্থ রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণির মুখ্য ভূমিকা সম্বন্ধে অনন্য ধারণায় প্রত্যয়ী ছিলেন।

তিনি বলতেন যে, শ্রমিক শ্রেণির সচেতনতা প্রকৃত রাজনৈতিক সচেতনতায় উত্তীর্ণ হতে পারে না যতক্ষণ না তাঁরা সমাজের অন্যান্য ধরনের শোষণ, হিংসা, অত্যাচার যা নিজেদের শ্রেণি ছাড়াও সমাজের অন্যান্য অংশের উপর হয়ে চলেছে, তার প্রতিরোধে সংগ্রাম করার জন্য প্রশিক্ষিত না হয়। বিভিন্ন জনজাতি, ধর্মীয় সম্প্রদায়, মহিলা সমাজ, কৃষক ও ক্ষেতমজুর শ্রেণি, অফিস কাছারি এবং সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত শ্রেণি ও সাধারণ নাগরিক, যারা যেখানে অত্যাচারিত, নিপীড়িত তাঁদের সবার সংগ্রামেই শ্রমিক শ্রেণি নেতৃত্ব নিতে এগিয়ে আসলেই গণতান্ত্রিক সংগ্রামের অন্তর্নিহিত সমাজতান্ত্রিক উপাদানসমূহ পুষ্ট হয়।

৫। **শ্রমজীবী শ্রেণির অগ্রসর অংশ ভ্যানগার্ডদের বিপ্লবী দল**

লেনিনের ভ্যানগার্ড সমন্বিত দল সম্বন্ধে পরবর্তীকালে যথেষ্ট বিতর্ক উত্থাপিত হয়েছে। অধিকাংশ বিতর্কে শ্রমিক শ্রেণির সাধারণ অংশ ও পেশাদার বিপ্লবী আদর্শবাদঋদ্ধ রাজনীতি সচেতন ভ্যানগার্ডদের পার্থক্যটি বিরোধী মতাবলম্বীরা অস্পষ্ট করে ফেলেন।

প্রকৃত অর্থে লেনিন কখনই পেশাদার ভ্যানগার্ড কর্মী ও নেতৃত্ব এবং সাধারণ শ্রমজীবী শ্রেণির মানুষদের মাঝে কোনো দেওয়াল তুলে দেওয়ার কথা ভাবেন নি বা বলেন নি। শ্রেণি সংগ্রামে অন্বিত শ্রমিকশ্রেণি তাদের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে ভ্যানগার্ড নেতৃত্ব আন্তরিকতার সঙ্গে অংশগ্রহণ করে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সাধারণ শ্রমিক শ্রেণিকে আলোকিত করবে। এভাবেই পরবর্তী পর্যায়ে নতুন প্রজন্মের কর্মীরা ভ্যানগার্ডের পর্যায়ে উন্নীত হবে।

সঙ্গে সঙ্গে লেনিন সর্বদাই গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার অনুশীলনের ওপর জোর দিয়েছেন। নেতৃত্বের পর্যায়ে উন্নীত ভ্যানগার্ড দল প্রতিটি স্তরেই নির্বাচিত হবেন এবং সাধারণ স্তরের কর্মীদের দ্বারা নেতৃত্ব থেকে কল ব্যাক পদ্ধতিতে প্রত্যাখ্যাত হবেন। (চলবে)

কলকাতা পৌর নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করার প্রতিবাদ

গত ২০ ও ২১ ডিসেম্বর ২০২১ কলকাতা পৌর নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করার প্রতিবাদে নদীয়া জেলার রাণাঘাট ও কৃষ্ণনগরে রাজ্য বামফ্রন্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিক্ষোভ সভার আয়োজন করা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন আর এস পি নদীয়া জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য কম. সমীর দাস।

সভায় বক্তব্য রাখেন, আর এস পি নদীয়া জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য কম. সুবীর ভৌমিক, কম. ত্রিদিবেশ ভট্টাচার্য, কম. বিশ্বনাথ সাহা, বিপ্লবী যুব ফ্রন্টের জেলা সম্পাদক প্রদীপ সরকার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

কম. সুবীর ভৌমিক তাঁর বক্তব্যে বলেন, নাগরিক অধিকারকে কি রাজ্য সরকার কি কেন্দ্রীয় সরকার উভয়েই বিভিন্ন ভাবে হরণ করার অপচেষ্টা করছে। প্রশাসন এই বিষয়ে যথাযথ ভূমিকা পলন করতে ব্যর্থ। গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগে কলকাতা পৌর নির্বাচনে তৃণমূলের সমর্থকরাও সমর্থ হননি। তিনি জনগণকে এ বিষয়ের বিরোধিতা করে সংঘবদ্ধ হবার আহ্বান জানান। কম. ত্রিদিবেশ ভট্টাচার্য বলেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বাভাবিক ও সুন্দর জীবন যাপনের জন্য মুষ্টিমেয় কিছু ভিক্ষার মতো আর্থিক সহায়তায় নিজেকে বিলিয়ে না দিয়ে, লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই অধিকার আদায় করতে হবে।

কম. বিশ্বনাথ সাহা বলেন, উভয় সরকারই নিজেদের মধ্যে মিথ্যা লড়াইয়ের গল্প শোনাতে সচেষ্ট হলেও জনগণকে এ বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে।

মার্কিন বিদেশ সচিব ব্লিঙ্কেনের প্রতিজ্ঞা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব এ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন সামরিক শক্তি বাড়ানো এবং গুণগত মান আরও উন্মুক্ত করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ব্লিঙ্কেনের দেশ আমেরিকা এশিয়ায় সহযোগী দেশগুলির সঙ্গে সামরিক এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও মজবুত করার পরিকল্পনা করছে। এই অঞ্চলে চিনের ক্রমবর্ধমান আধিপত্য বিস্তারের রণনীতির মোকাবিলা করার জন্য যথাযথ প্রতিরোধ করার ব্যবস্থার কথা ভাবছেন ব্লিঙ্কেন।

ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে শান্তি এবং সমৃদ্ধি স্থিতিশীল করার লক্ষ্যে বাইডেন প্রশাসন মিত্র দেশগুলির সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক এবং উন্নততর সামরিক সম্পর্ক স্থাপনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সম্প্রতি এই অঞ্চলে চিনের আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্যে মার্কিন রণনীতি ঢেলে সাজানোর চিন্তাভাবনা করছে মার্কিন প্রশাসন। প্রসঙ্গত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং এশিয়ার মিত্র দেশগুলির প্রতিরক্ষা শিল্প, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং সরবরাহ লাজইনের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ নতুন রণনীতির অঙ্গ হতে পারে বলে মন্তব্য করেন ব্লিঙ্কেন। অস্ট্রেলিয়া পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন সাবমেরিন নির্মাণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে চলেছে। ব্লিঙ্কেন অবশ্য বলছেন, চিন অথবা আমেরিকার মধ্যে যে কোনও একটা দেশকে বেছে নেওয়ার জন্য দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির উপর চাপ সৃষ্টি করতে আমেরিকা চায় না। কিন্তু বাস্তবে উত্তর পূর্ব এশিয়া থেকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে, মেকং নদী থেকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলিতে চিনের আগ্রাসী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে অজস্র অভিযোগ তুলেছেন মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব। মার্কিনী অভিযোগের জবাবে চিনের পররাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে বলা হয়েছে ব্লিঙ্কেনের সর্বশেষ অভিযোগগুলির স্ব-বিরোধিতা অত্যন্ত স্পষ্ট। একদিকে চিনের তথাকথিত আগ্রাসনের কথা বলা হচ্ছে অপর দিকে, দাবি করা হচ্ছে চিনের সঙ্গে সংঘর্ষে যেতে আমেরিকা আগ্রহী নয়। উপরন্তু আমেরিকা এতদঞ্চলে ঘন ঘন যুদ্ধ জাহাজ এবং যুদ্ধ বিমান পাঠিয়ে অযথা উত্তেজনা বৃদ্ধি করছে বলে পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ওয়াং ওয়েন মিন মন্তব্য করেছেন। এই দুনিয়ার মহাশক্তিধর দুই দেশ চিন এবং আমেরিকা একে অপরকে টেক্কা দেওয়ার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ। চিনের বাণিজ্যের পরিমাণ ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলিতে এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় আমেরিকাকে ছাড়িয়ে গেছে। ২০২০ সালে চিনের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ হল ৬৮৫ বিলিয়ান ডলার, আমেরিকা থেকে দ্বিগুণেরও বেশি। চিনের বাড়বাড়ন্তে বাইডেন প্রশাসন বিশেষ উদ্বিগ্ন।

কম. চিত্তরঞ্জন চক্রবর্তীর জীবনাবসান

জলপাইগুড়ি জেলার বিশিষ্ট আর এস পি নেতা কম. চিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী গত ২১ ডিসেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৮৬ বছর। অতিশয় মার্জিত রুচির অধিকারী স্থানীয় মানুষদের বিশেষ শ্রদ্ধেয় চিত্তবাবু দীর্ঘকাল শিক্ষকতার পেশায় যুক্ত ছিলেন। তিনি ১৯৭৮ সালে প্রথম পঞ্চায়েত নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হন। তিনি ময়নাগুড়ি প্রবীণ নাগরিক সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। জলপাইগুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষক চিত্তবাবু তাঁর ছাত্রজীবন থেকেই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ভাবাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অবহেলিত ডুয়ার্স অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন। আর এস পি'র ময়নাগুড়ি জোনাল কমিটির সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন বেশ কিছুকাল। অবিভক্ত জলপাইগুড়ি জেলার আর এস পি নেতা হিসাবে তিনি জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হিসেবেও নিষ্ঠার সঙ্গে গণআন্দোলন সংগঠিত করার কাজে যুক্ত ছিলেন।

কমরেড চক্রবর্তীর জন্ম অধুনা বাংলাদেশের ময়মনসিংহে। অবাঞ্ছিত দেশভাগের যন্ত্রণা বুকে নিয়ে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ময়নাগুড়িতে স্থায়ীভাবে থাকতে শুরু করেন। তাঁর আনন্দনগরপাড়া অঞ্চলের বাসগৃহে আর এস পি এবং অন্যান্য বামপন্থী দলের নেতৃবৃন্দ প্রায়শই যাতায়াত করতেন। সেই বাড়িতেই তাঁর দেহাবসান হয়।

তাঁর মরদেহের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বহুসংখ্যক মানুষ সমবেত হয়েছিলেন। চিত্তবাবুর তিনপুত্র ও এককন্যা বর্তমান। চিত্তবাবুর সংগ্রামী স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আর এস পি জলপাইগুড়ি জেলা দপ্তরে দলীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়।

কম. চিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী লাল সেলাম।
কম. চিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী অমর রহে॥

নদীয়ায় কম. অবনী রায়ের স্মরণসভা

গত ২১ ডিসেম্বর ২০২১ মঙ্গলবার নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর লোকাল কমিটির অন্তর্গত দৈ-এর বাজার শাখা কমিটির উদ্যোগে প্রয়াত কমরেড অবনী রায়ের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমরেড নারায়ণ সমাদ্দার।

কমরেড অবনী রায়ের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হবার আগে আর এস পি দলের অবিসংবাদিত নেতা কমরেড ত্রিদিব চৌধুরীর আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়। মাল্যদান করেন আর এস পি নদীয়া জেলার সম্পাদক কম. শঙ্কর সরকার ও নদীয়া জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য কম. সুবীর ভৌমিক।

কম. অবনী রায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করার মধ্য দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। মাল্যদান করেন আর এস পি নদীয়া জেলা সম্পাদক কম. শঙ্কর সরকার, নদীয়া জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য কম. সুবীর ভৌমিক, কম. ত্রিদিবেশ ভট্টাচার্য, কম. সমীর দাস, কম. বিশ্বনাথ সাহা, জেলা কমিটির অন্যতম সদস্য কম. আরতি রাউত, কম. পূর্ণেন্দু ঘোষ, কম. অশোক ঘোষ, দৈয়ের বাজার শাখা সম্পাদক কম. লক্ষ্মণ ঘোষ, নিখিল বঙ্গ মহিলা সংঘের জেলা সম্পাদিকা কম. ছায়া রায়, নিখিল বঙ্গ মহিলা সংঘের নেত্রী কম. মাস্তু ঘোষ, কম. কল্পনা হালদার, কম. ঝর্ণা ঘোষ, বিপ্লবী যুব ফ্রন্টের কম. পরিমল সরকার, সি পি আই (এম এল) নেতৃত্ব কম. শান্তি রঞ্জন বিশ্বাস, এলাকার বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাক্তার কার্তিক সাহা সি পি আই (এম এল) নেতৃত্ব সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। স্মরণসভায় প্রস্তাব উত্থাপন করেন কম. হরেকৃষ্ণ অধিকারী।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে আর এস পি নদীয়া জেলা সম্পাদক কম. শঙ্কর সরকার বলেন, কম. অবনী রায়ের আদি নিবাস বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বরে থাকলেও তাঁর বাল্যকালেই পিতা দিল্লী চলে যাওয়ার কারণে বিদ্যালয় শিক্ষা দিল্লীতেই সম্পন্ন হয়েছে। ১৯৫৯ সালে দিল্লী থেকে কলকাতায় কলেজ জীবনের প্রথম দিকেই তিনি পি এস ইউ'র সঙ্গে যুক্ত হন।

নদীয়া জেলায় তাঁর সাংসদ তহবিল থেকে বিভিন্ন বিদ্যালয়সহ অন্যান্য জায়গায় পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, রাস্তার উন্নয়ন সহ বিভিন্ন ধরনের কাজে বিপুল পরিমাণ আর্থিক সহায়তা প্রদান রেন। জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য কম. সুবীর ভৌমিক বলেন, কম. অবনী রায় দীর্ঘ বছরছর সর্বভারতীয় স্তরে দল পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেছেন। তিনি ১৪ বছর রাজ্যসভায় দলের সাংসদ হিসেবে কাজ করেছেন। ইউ টি ইউ সি-র সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন। জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য কম. ত্রিদিবেশ ভট্টাচার্য বলেন, কম. অবনী রায়ের মৃত্যু আর এস পি'র সর্বভারতীয় স্তরে ক্ষতি করল শুধু তাই নয়, বাম আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিশেষ শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, আর এস পি জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য কম. বিশ্বনাথ সাহা, সি পি আই (এম) নেতৃত্ব কম. শান্তিরঞ্জন বিশ্বাস, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাক্তার কার্তিক সাহা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ

আন্তর্জাতিক সংগীতের মধ্য দিয়ে সভার কাজ শেষ হয়।

স্মরণসভাকে কেন্দ্র করে অর্ধনমিত রক্তপতাকায় এলাকায় ভরে ওঠে এবং এলাকার বিভিন্ন অংশের মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

সমাজতান্ত্রিক দর্শনবোধ ভিন্ন প্রকৃত বিপ্লবী সংগঠন হয় না

মনোজ ভট্টাচার্য

বিপ্লবী গণসংগ্রামের পরিচালনার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত, তাঁদের প্রচলিত বা গতানুগতিক ভাবনায় আবদ্ধ থাকলে আর চলবে না। ভারতের মতো একটি বৈচিত্রপূর্ণ আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বছর পনের কুড়ি আগেও প্রতিনিয়ত সংগঠনের দৈনন্দিন কাজগুলি নিষ্ঠা সহকারে করে গেলে সংগঠনের অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব ছিল; এখন শুধুমাত্র তা হলেই চলবে না। অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয়ে গেছে।

সাধারণভাবে গভীর রাজনৈতিক ভাবনা ও বোধ ব্যতীত সংগঠন গড়ে ওঠে না। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ভাবাদর্শ সমন্বিত পথে আর্থ- সামাজিক পরিবর্তন সাধনের নির্দিষ্ট পথে সাংগঠনিক কর্মধারা পরিচালনায় বিশেষ সময়োপযোগী ভাবনার গুরুত্ব অপরিসীম।

রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ ছাড়া যথাযথ সংগঠন গড়ে উঠতে পারে না। আবার কোনো সময়েই সরলরৈখিক কোনো ভাবনা নিয়েও সংগঠন গড়ে তোলা যায় না। প্রতিনিয়ত সংগঠনের সবকটি স্তরে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার নিরন্তর আলোচনা অত্যন্ত জরুরি। নানা ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষায় পরিকল্পিতভাবে করার চেষ্টা করতে হবে।

সমস্ত স্তরের সংগঠকদেরই রাজনৈতিক চর্চার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত থাকা একান্ত প্রয়োজন। ভিন্ন ভিন্ন চেতনা ও বোধ নিয়ে চললে সংগঠনের নানাস্তরের মধ্যে অনবরত ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা প্রবল। দলের অভ্যন্তরে ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা ও বোধের নিটোল ঐক্য গড়ে তোলা একান্ত জরুরি। সমাজ পরিবর্তনের পথে সংগঠনকে চালনা করার প্রসঙ্গটি যদি মুখ্য হয় তাহলে, কোনকিছুই লঘু চিত্তে গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

অপরিবর্তনীয় নজির বলে মনে করে কোনো একটি স্থির মতামতে পরিচালিত হওয়া সঠিক নয়। সমাজ ব্যবস্থার প্রগতিশীল পরিবর্তন যদি মুখ্য বিবেচ্য হয় তাহলে, প্রচলিত আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন একান্ত জরুরি। মার্কসবাদী পথ অন্বেষণে কোনও নির্ধারণবাদী সিদ্ধান্ত পরিহার করেই চলার পথ নির্ণয় করতে হবে।

বস্তুবাদী দর্শন সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন বোধ গড়ে তোলা খুবই জরুরি। ভাববাদী দর্শনের বিরুদ্ধে ক্রমাগত লড়াই না করে মার্কস এঙ্গেলস লেনিনের পথে দল গড়া অসম্ভব। বুর্জোয়া ব্যবস্থায় প্রায়শই উল্লেখ করা হয় যে, 'রাজনীতি সম্ভাব্যতার শিল্প'। এই শব্দগুচ্ছগুলি যথেষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে মানুষের মননকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এ ধরনের ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে। মার্কসবাদী আদর্শে স্থিত সমস্ত কর্মীকেই পরিচ্ছন্নভাবে উপলব্ধি করতে হবে যে, তাঁদের কাছে রাজনীতির অর্থ ''আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভবকে সম্ভব করার শিল্প।'' এই প্রত্যয় না থাকলে ভ্লাদিমির লেনিনের নেতৃত্বে ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লব সম্ভব করা কখনোই সম্ভব হত না। বুর্জোয়া মূল্যবোধ এবং মনন দৃঢ় প্রত্যয়ে অস্বীকার করতে হবে।

সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন প্রতিনিয়ত লালন করতে না পারলে মার্কসবাদী রাজনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পথে সংগঠন গড়ে তোলা এক অসম্ভব প্রকল্প। আর বহুজনের মধ্যে বিশেষ করে, অবদমিত শ্রেণিগুলির মধ্যে এই মনোভঙ্গিটি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত না হলে একটি বিপ্লবমনস্ক দল সেভাবে পরিব্যাপ্ত হতে পারে না। একটি বিশেষ স্তরে উন্নীত হবার পরে নতুন করে সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তাই অনেকের কাছে হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। যেমন তেমন করে সংগঠনের অবয়ব বৃদ্ধির কোনও অর্থ নেই।

নিবিড় অনুশীলন এবং নিপীড়িত মানুষের সঙ্গে ধারাবাহিক ও সৎ সম্পর্ক গড়ে তুলতে উৎসাহী নয়, এমন মানুষদের অতিরিক্ত ভিড় দলের সংগঠনকে ঘোষিত পথ থেকে বিচ্যুত করে। একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে যা, প্রাথমিকভাবে সংগঠন যে ব্যবস্থার আমূল গুণগত পরিবর্তন সম্ভব করতে তৈরী হয়েছিল তা, পথভ্রষ্ট হয়ে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার একটি অঙ্গ হিসেবে তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে উৎসাহী হয়ে পড়ে। সেই ধরনের একটি ঘোষিত প্রগতিপন্থী দলের বহু সংগঠক বাস্তব অবস্থার অজুহাত দিয়ে বুর্জোয়া ব্যবস্থার দীর্ঘস্থায়িত্বকে নিশ্চিত করে তোলে। সমাজ পরিবর্তন সম্ভব করার পথে চলতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

১৯০২ সালে রুশ দেশের আর এস ডি এল পি'র মতো দলকে বিপ্লবমুখী করার জন্য যে বলশেভিক পার্টির অবতারণা করেছিলেন ভ্লাদিমির লেনিন, প্রকৃত অর্থে তা ঐতিহাসিক এবং অনুকরণীয়। ভুলে গেলে চলবে না যে, বলশেভিক পার্টির প্রতিষ্ঠাকাল থেকে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই লেনিনের দল রাশিয়ার মতো একটি পশ্চাদপদ ও নানা জটিলতা পূর্ণ আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিলয় ঘটিয়ে বৈপ্লবিক রূপান্তর সম্ভব করতে পেরেছিল। লেনিন অনুসৃত সাংগঠনিক রীতিনীতির অন্ধ অনুকরণ প্রচেষ্টা বর্তমান কালে সময়োচিত বলে বিবেচিত না হতেই পারে। দিনকালের বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কিন্তু মার্কসবাদী সংগঠন গড়ে তোলার ভিত্তি হিসেবে সেইসব পথনির্দেশ বিবেচিত হতেই পারে।

রুশ দেশের মহান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত হবার পরে শতাধিক বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। দিন দুনিয়ার প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। মার্কসবাদ অবশ্যই কোনও ইট কাঠ বা পাথর নয়। কোনও 'ডগমা' বা আপ্তবাক্য অবশ্যই নয়। মার্কসবাদ প্রতিষ্ঠিত বাস্তব অবস্থার সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপলব্ধ শিক্ষা নিয়েই অগ্রসর হবার পথ নির্ণায়ক। লেনিন মার্কসবাদের সফল বাস্তব রূপকার। তিনি দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শন নিবিড়ভাবে অধ্যয়ন ও আত্মস্থ করেই রুশ মহাবিপ্লবের রূপরেখা নির্ণয় করেছিলেন। কোনও যান্ত্রিক ব্যাখ্যার বশবর্তী হয়ে তিনি কখনোই সিদ্ধান্ত নেন নি।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে তিনি যখন নব প্রতিষ্ঠিত বলশেভিক পার্টির সাংগঠনিক পদ্ধতি অনুসরণ করার উদ্দেশ্যে What is to be done বা 'কি করিতে হইবে' রচনা করেছিলেন তখন, তাঁর সামনে রুশ দেশের বাস্তব অবস্থা বিশেষভাবে বিশ্লিষ্ট ছিল। ওই বিশাল ভূখণ্ডে আর্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন সম্ভব করতে যেমন সাংগঠনিক শৃংখলা সম্পন্ন সংগঠন ও সাংগঠনিক প্রক্রিয়া প্রয়োজন তাই বিধৃত করেছিলেন তাঁর রচনায়। এই দেশের মানব সমাজের যেসব জটিলতা এবং চারিত্রবৈশিষ্ট্য ছিল তার দিকে বিশেষ মনযোগী হয়েই তিনি ওই বিশেষ পুস্তকটি রচনা করেছিলেন।

এই বিষয়টি অবশ্যস্বীকার্য যে, তৎকালীন রুশীয় সমাজবাস্তবতা এবং আন্তর্জাতিক আর্থ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিগত এক শতককালে প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থা একটি নির্দিষ্ট স্থানে স্থির নেই। এই সময়কালের মধ্যে দু'টি মারণাত্মক বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। জার্মান ইতালি প্রভৃতি দেশে নৃশংস ফ্যাসিবাদী শাসনের উদ্ভব ও পরাভব হয়েছে। বিশ্বের মানব সমাজ সেই ভয়ঙ্কর সময়ের স্মৃতি এখনও বহন করছে।

পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ তাদের শোষণ ও শাসন বলবৎ রাখতে নানা ফন্দি ফিকিরের অবতারণা করেছে। জনকল্যাণকামী পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার পরীক্ষানিরীক্ষা যেমন হয়েছে তেমনি, ওই ব্যবস্থার অমোঘ এবং ঘুরে ফিরে উদ্ভূত সংকট মুক্তির অসেতুসম্ভব প্রচেষ্টাও হয়েছে।

সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বহু ধরনের মৌলিক অধিকার এখনও অধরাই রয়েছে। এদিক থেকে দেখলে অসাফল্য যেমন আছে তেমনই, মানব সমাজের আশা আকাঙ্ক্ষা এবং বোধেরও অনেক পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে বিশ্বপুঁজিবাদ শিক্ষাগ্রহণ করেছে। শোষণ তীব্রতর হলেও পুঁজিবাদ সেই আক্রমণের পদ্ধতি অনেকটা পাল্টে ফেলে ভয়াবহ শোষণের প্রসঙ্গটি অনেকাংশে গোপন করার পদ্ধতি নিয়েই চলেছে। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এবং মাও জে দং-এর চীনের পুঁজিতান্ত্রিক পথে দুঃখজনক অবনমন বাস্তব সত্য। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতেও অধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে নয়াউদারবাদের প্রত্যক্ষ প্রভাবে শ্রমিক শ্রেণির একাংশমাত্র সংগঠিত ক্ষেত্রে রয়েছে।

বর্তমানকালে দুনিয়া জুড়ে উৎপাদন পদ্ধতি ও প্রকরণের তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে। বহু সংখ্যক স্থায়ী শ্রমিকের দৈনন্দিন কাজ ঠিকা প্রথার শ্রমিকদের কাছে পরিকল্পনামাফিক হস্তান্তরিত হয়েছে। বস্তুত, অতীতের মতো একটি কারখানার অভ্যন্তরে সমস্ত উৎপাদন আর সীমাবদ্ধ নেই। শ্রমিকদের বিপুল অংশই অসংগঠিত শিল্প কারখানায় চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে কোনক্রমে দিন গুজরান করছে। অনেক ক্ষেত্রেই ঠিকা শ্রমিকের সঙ্গে স্থায়ী শ্রমিকদের এক ধরনের দ্বন্দ্বও লক্ষণীয়।

এমন এক পরিণতির বাস্তব অবস্থায় যান্ত্রিকভাবে একান্ত পুস্তক ভিত্তিক সাংগঠনিক রীতি পদ্ধতি একই রকম থাকতে পারে না। নানা ক্ষেত্রে বাস্তবানুগ পরিবর্তন সাধন প্রয়োজন। এর অর্থ এমন নয় যে, লেনিন নির্দেশিত সাংগঠনিক পদ্ধতির মূল বিষয়গুলি বিস্মৃত হয়ে একটি সমাজগণতান্ত্রিক (Social democratic) পার্টির মতো ঢিলেঢালা, যখন যেমন, তখন তেমন দলীয় সংগঠন গড়ে উঠবে।

দলীয় শৃংখলা রক্ষা করতে সর্বদাই বিশেষভাবে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। আবার দল পরিচালনায় সর্ব ধরনের আমলাতান্ত্রিক মানসিকতা দৃঢ়ভাবে বর্জন করে সামূহিক নেতৃত্বের ওপর চলতে হবে। একইভাবে উপদলীয় সমস্ত ধরনের কাজকর্ম বন্ধ করতে প্রথমদিকেই সচেষ্ট হতে হবে। সংগঠনের দৈনন্দিন পরিচালনায় যে সমস্ত সমস্যা বা সম্ভাব্য সমস্যাগুলি অনুভূত হবে, সেগুলি সময়ক্ষেপ করে সিদ্ধান্তহীনতা প্রশ্রয় পেলে সমস্যা জটিলতর হয়। প্রথমদিকেই এগুলির নিষ্পত্তি জরুরি। অনৈতিক কোনো কাজ যিনি করছেন বা যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে বা হচ্ছে তাঁর বিরুদ্ধে উচ্চতর নেতৃত্বকে তৎপরতার সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। নেতাদের ব্যক্তিগত পছন্দ, অপছন্দ বিশেষভাবে পরিত্যাজ্য। রাম অন্যায় করলে যে বিধান, রহিম অন্যায় করলেও একই বিধান হওয়া উচিৎ।

মার্কসবাদী লেনিনবাদী সংগঠন পরিচালনায় অতীতে কোনও সংগঠক ভাল কাজ করেছেন তার নিরিখে বিচার করে সিদ্ধান্ত নেওয়া যথার্থ নয়। সুদূর অতীতের কর্মকৃতি বর্তমানের অনৈতিকতা বা যে কোনও অপরাধকে মান্যতা দিতে পারে না। কোনও সময় দলের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে কৃতিত্বের সঙ্গে কর্তব্য সমাধা করার অর্থ পরবর্তীকালে অনৈতিকতার সঙ্গে কোনভাবে যুক্ত থাকার পাসপোর্ট নয়। সমগ্র জীবন জুড়ে দলের আদর্শ ও কর্মসূচি নিবিড়ভাবে ও সততার সঙ্গে প্রতিপালনই একজন মার্কসবাদী লেনিনবাদী পার্টিকর্মীর একমাত্র দায়িত্ব। এই দায়িত্বপালনে অবহেলা বা স্বচ্ছতার অভাব অবশ্যই অমার্জনীয় হিসেবে বিবেচিত হবে।

বর্তমান সময়ে যখন অতি আগ্রাসী সংকটাপন্ন পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বামপন্থী শক্তিগুলির অস্তিত্ব বিলুপ্ত করার অপচেষ্টায় বদ্ধপরিকর তখন, বামপন্থীদের নিবিড় যত্নের সঙ্গে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েই সার্বিক ষড়যন্ত্র বানচাল করার কাজ করতে হবে। কোনও শর্টকাট পদ্ধতির সন্ধান করা অর্থহীন। বর্তমান কঠিন ও জটিল সময়ে যখন বিক্রি হয়ে যাওয়া সংবাদ মাধ্যমগুলি একান্তভাবে শাসকশ্রেণির স্বার্থরক্ষায় সাধারণ মানুষের চেতনা ও বোধ অবশ করার জঘন্য খেলায় মেতে আছে সেই সময়কালে, বামপন্থী বিশেষ করে, মার্কসবাদে প্রত্যয়শীল সমস্ত রাজনৈতিক কর্মীদের গতানুগতিক দায়সারা পথ বর্জন করে নতুন উদ্যমে অবদমিত শ্রেণির মানুষদের সংগঠিত করার কাজ করতে হবে।

রাজনৈতিক আদর্শবোধ এবং তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সংগঠন গড়ে তোলার কাজ খুব সহজ নয়। দলের সমস্ত স্তরের সদস্য ও কর্মীদের মধ্যে আদর্শগত ঐক্যসাধন বিশেষ জরুরি। অনস্বীকার্য যে, আমাদের রাজ্যে বা দেশে বিগত বেশ কয়েক বছরে নানাভাবে দলের অভ্যন্তরে আদর্শনৈতিক চর্চা নিয়মিত ভাবে হচ্ছে না। এই ত্রুটি নিঃসন্দেহেই দলের উর্ধ্বতন নেতৃত্বের। আবার নিম্নতর স্তরে ক্রিয়াশীল দলীয় সদস্যদের যে উৎসাহ এবং উদ্যোগ থাকলে উর্ধতন নেতৃত্ব দলীয় কর্মসূচির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে নিয়মিত আদর্শনৈতিক চর্চা সংগঠিত করে দলকে শক্তিশালী করতে পারতেন তা হয়ে ওঠেনি।

দল পরিচালনায় দৈনন্দিন ভিত্তিতে কতকগুলি কাজ করতেই হয়। নিম্নতম স্তর থেকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির অনুশীলন এবং সমস্ত সদস্যকে যুক্ত করে আলোচনা সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তার অর্থ এমন নয় যে, শুধু প্রথা মেনে নানা স্তরে সভা করলেই কাজ শেষ। বস্তুত, দলের সর্বস্তরের কর্মীদের মধ্যেও সচেতনভাবে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির সঙ্গে সম্যক অনুভূতি বোধ নির্মিত না হলে কর্মসূচিগুলির বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। কোনও মার্কসবাদী লেনিনবাদী দলে শুধুমাত্র ওপর থেকে নির্দেশ দিয়ে কাজ করার সুযোগ নেই। নিম্নস্তরে কমিটিগুলিকেও কর্মসূচি প্রণয়নের সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। সবাই মিলে সবার জন্য এবং শেষ পর্যন্ত জনসাধারণের বিশেষত, শ্রমকারী জনগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষার কাজই প্রধান।

উন্নত সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের পরীক্ষা নিরীক্ষা দলের অভ্যন্তরীণ পরিচালন পদ্ধতির একান্ত অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত। উর্ধতন নেতৃত্ব সম্পর্কে জোর করে সমীহ ও সম্মান উৎপন্ন হয় না। যা হয়, তা যান্ত্রিকভাবে আমলাসুলভ। একটি কমিউনিস্ট বা বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধ বর্জিত সংগঠন গড়ে উঠলে অবশেষে তা কোনও কাজে আসতে পারে না।

Vol. 68 Issue No. 40 শনিবার ১৮ ডিসেম্বর, ২৫ ডিসেম্বর (যুগ্ম সংখ্যা) আট
RN No. 2710/57 Rupees Two [By Air Rs. 2.10]
Phone : 2229-4653; e-mail : kranti.press@yahoo.com

গণবার্তা

কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচন

১-এর পাতার পর

করার পরেই এই বেফাঁস মন্তব্যটি করে বসেন। এমন এক মন্তব্যের পরেই নতুন করে প্রমাণিত হল যে, বামপন্থীরা দীর্ঘকাল যাবৎ যে অভিযোগ করে এসেছেন যে, গভীর যোগসাজসের মাধ্যমেই তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি চলে তা একান্তভাবেই সত্য বলে প্রমাণিত হল।

মমতা ব্যানার্জীর স্বৈরশাসনের প্রকৃতির সঙ্গে ভয়ঙ্করভাবে সাম্প্রদায়িক জিগির নির্ভর নরেন্দ্র মোদীর স্বৈরশাসনের কোনো ফারাকই নেই। শুধুমাত্র নামেই যা পার্থক্য। উভয় দলই চরমভাবে সশস্ত্র দুর্বৃত্তনির্ভর এবং গণতন্ত্র বরবাদ করতে উদ্‌গ্রীব। নরেন্দ্র মোদী বিজেপি দলে একনায়কত্ব চালান আর মমতা ব্যানার্জীর পারিবারিক বা ব্যক্তিগত রাজনৈতিক ব্যবসায়ে তিনিই শেষ কথা।

আমরা অল্প কিছুকাল আগেই বিজেপির বিপ্লব দেব-এর নেতৃত্বাধীন ক্ষুদ্র রাজ্য ত্রিপুরায় লক্ষ করেছি পৌরনির্বাচনগুলিতে বিজেপি জবরদস্তি বা গায়ের জোরে পুলিশ প্রশাসনকে নির্লজ্জভাবে ব্যবহার করে একশ' শতাংশ আসনে জয় নিশ্চিত করেছে। বামপন্থী দলগুলিকে অপ্রাসঙ্গিক করে দেবার লক্ষ্যে বিজেপি উগ্রভাবে সমস্ত রকমের অনৈতিক পথ অবলম্বন করে নির্বাচনে জয় হাসিল করেছে। সহায় তৃণমূল কংগ্রেস। সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা অর্থ এবং প্রশাসনের নির্মম ব্যবহারে মূক হয়ে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ বলে আখ্যায়িত সংবাদ মাধ্যমকে অবনমিত করেছে।

কৌতুককর নয়, অতীব ন্যক্কারজনকভাবে হঠাৎ করে তৃণমূল কংগ্রেস ত্রিপুরা রাজ্যে বিপ্লব দেবে-এর সরকারের বিরুদ্ধে জনমতের একাংশকে বিভ্রান্ত করে বামপন্থীদের শক্ত সাংগঠনিক ঘাঁটিগুলিতে ভোট বিভক্ত করার অপকর্মে প্রবৃত্ত হয়েছিল। নিছক পারস্পরিক বোঝাপড়া করেই বাম ভোটের একাংশে ভাগ বসিয়ে বিজেপির জয় নিশ্চিত করার কদর্য কাজ করেছে। বিজেপি ঠিক যেভাবে ২০২১ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচনে সরকার বিরোধী জনসমর্থনের একটি বড় অংশকে প্রভাবিত করে তৃণমূল কংগ্রেসের জয় নিশ্চিত করেছিল। এ যেন একে অন্যের পরিপূরক।

এই রাজ্যেও লক্ষ করা গেছে যে, সংবাদমাধ্যমগুলি বিশেষত টিভি চ্যানেলগুলির বৃহদংশ লজ্জা শরমের তোয়াক্কা না করেই বিজেপি আর তৃণমূল কংগ্রেসের 'বাইনারি' বা দ্বিপাক্ষিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা হিসেবেই গণমাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন প্রচার করে গেছে। অর্থ এবং প্রশাসনিক প্রভাব খাটিয়েই যে এমন কুকর্ম বিজেপি ও তৃণমূল উভয় দলই করেছে তা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। ত্রিপুরা রাজ্যে পৌর নির্বাচনগুলিতে বিজেপি'র জয় নিশ্চিত করার পর এখন আর তৃণমূলীদের দেখাই নেই? এমনকি, আগরতলা পৌরসভায় একমাত্র জয়ী তৃণমূল কাউন্সিলর কোনো সময় অপেক্ষা না করেই দ্রুত বিজেপি দলে যোগদান করেছেন। মনে পড়ে এই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের পরেই বিজেপি কেমন যেন হারিয়ে গিয়েছে!

কলকাতা কর্পোরেশনের ভোটেও ঠিক একইভাবে তৃণমূল ও বিজেপি'র বাইনারি প্রচার করেছে বিশেষ করে এবিপি আনন্দ সহ অনেকগুলি গণমাধ্যম লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে অনবরত প্রচার করে গেছে তৃণমূলের বিরোধী দল একমাত্র বিজেপি। কর্পোরেশন ভোটের আগে নির্বাচনী সমীক্ষা করে জানিয়ে দিয়েছিল যে, বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের কোনো অস্তিত্বই পৌর নির্বাচনে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অর্থাৎ, হয় তৃণমূল নয়তো বিজেপি। এই দুই দলের বাইরে অন্য কোনো ভাবনাচিন্তারই অবকাশ নেই।

নির্বাচনের নামে সম্পূর্ণ প্রহসন হলেও নির্বাচনী ফলাফলে কলকাতার নাগরিকরা টিভি চ্যানেল প্রচারিত বিভ্রমের ফাঁদে পড়েন নি। প্রমাণ হয়েছে যে, তৃণমূলের প্রকৃত সহযোগী বিজেপি। এই দু'টি দলের মধ্যে গভীর সখ্য ও বোঝাপড়া। বিজেপি'র অস্তিত্ব বিপন্ন হয়েছে। বামফ্রন্টই সমস্ত ধরনের জাল জুয়াচুরি সত্ত্বেও দ্বিতীয় শক্তি হিসেবে নিজেদের অবস্থান নিশ্চিত করতে পেরেছে। রিগিং বা কারচুপি প্রবলভাবে হলেও এই সরল সত্যটি উদ্ভাসিত হয়েছে।

কলকাতার অধিবাসীরা পরিচ্ছন্নভাবেই উপলব্ধি করেছেন যে, সত্য পথে বা স্বচ্ছভাবে সুষ্ঠু নির্বাচন হলে বামফ্রন্ট বহু ওয়ার্ডেই জয়লাভ করতে সক্ষম হত। এমনকি, কংগ্রেসের প্রার্থীরা পর্যন্ত হিংস্র আক্রমণের শিকার হয়েছেন এবং পুলিশবাহিনী কর্ত্রীর নির্দেশে সেইসব ন্যক্কারজনক ঘটনাগুলি নিশ্চুপ থেকে উপভোগ করেছে তা নিশ্চিতভাবেই গণতন্ত্রের ন্যূনতম চিহ্নও অবলুপ্ত করার পক্ষে যথেষ্ট। তৃণমূল কংগ্রেসের গণতন্ত্র বিরোধী স্বরূপটি স্পষ্টতর হয়ে পড়েছে।

এখন বেশ পরিষ্কারভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে, তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার থাকলে ক্রমে গণতন্ত্রের সলিল সমাধি ঘটবে। দিল্লিতে নরেন্দ্র মোদীর স্বৈরতান্ত্রিক শাসন আর কলকাতায় মমতা ব্যানার্জীর স্বেচ্ছাচারী সরকার। ভারত রাষ্ট্র যেমন চরম বিপদে ঠিক তেমন ভাবেই পশ্চিমবঙ্গও। এ থেকে সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষা করতে লাগাতার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রাবল্য সৃষ্টি করেই অগ্রসর হতে হবে। প্রচলিত নির্বাচনী ব্যবস্থার মাধ্যমে আমূল আর্থ সামাজিক পরিবর্তনের আশু লক্ষণ দেখা না গেলেও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার লড়াই চালাতে চালাতে মূল লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথ বের করতে হবে।

কলকাতা কর্পোরেশনে আর এস পি প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোট (শতাংশ)

১৪ নং ওয়ার্ড — কম. স্বপন ঘোষ	১২.৩ শতাংশ
১৫ নং ওয়ার্ড — কম. দীপা সাহা	১০.৭৯ শতাংশ
৪০ নং ওয়ার্ড — কম. কাবেরী ভট্টাচার্য	৮.১১ শতাংশ
৫১ নং ওয়ার্ড — সুনেত্রা ওঝা	২.৭৭ শতাংশ
৬৫ নং ওয়ার্ড — কম. অনুলেখা সিন্‌হা	১৫.২৯ শতাংশ
৯৪ নং ওয়ার্ড — কম. বুলা শীল	১১.৩৯ শতাংশ
৯৯ নং ওয়ার্ড — কম. শিখা মুখার্জী	১২.১৬ শতাংশ
১০৪ নং ওয়ার্ড — কম. ধীরাজ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়	১২.১৬ শতাংশ
১০৬ নং ওয়ার্ড — কম. অলোক চ্যাটার্জী	১.০৬ শতাংশ

রাজ্য বামফ্রন্টের আবেদন

বিষয় : ৫টি কর্পোরেশন এবং অন্যান্য পৌরসভার নির্বাচন সংক্রান্ত

প্রিয় কমরেড,

২৪ ডিসেম্বর, শুক্রবার বামফ্রন্টের জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সব শরিক দলের শীর্ষ নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। শোকপ্রস্তাবের মধ্য দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়।

১। কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনী ফলাফলের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। নির্বাচনের বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই শাসক দল আমাদের পোলিং এজেন্ট ও নির্বাচনী কর্মীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি দিয়েছে, এমনকি, অপহরণের ঘটনাও ঘটেছে। সকাল থেকেই নতুন কায়দায় অসংখ্য বুথে অবাধে ভোট লুঠ হয়েছে। পোলিং এজেন্টদের উপর আক্রমণ হয়েছে। বুথ থেকে বলপূর্বক বের করে দেওয়া হয়েছে। পোলিং এজেন্ট, প্রার্থী, নির্বাচনী এজেন্ট ও নির্বাচন কর্মীদের উপর দৈহিক আক্রমণ হয়েছে। এমনকি বোমা, পিস্তল ও লাঠি নিয়ে হিংস্র আক্রমণের ঘটনাও ঘটেছে। বাইরের জেলা থেকে লোক এনে ব্যাপক ছাপ্পা ভোটও করানো হয়েছে।

রাজ্য নির্বাচন কমিশন এবং রাজ্য প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদতে শাসক দল কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনকে কার্যত নতুন কায়দায় প্রহসনে পরিণত করেছে। ভোটারদের আঙুলে লাগানো কালি এমনই ব্যবহার করা হয়েছে যে, হাত ধোয়ার পরেই উঠে গিয়েছে। ফলে জাল ভোট দেওয়া সহজ হয়েছে। আদালতের নির্দেশে বুথে লাগানো সিসি টিভিকে মাঝে মাঝে এবং কোথাও পুরোপুরি বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। এই পরিস্থিতির মধ্যেও বামফ্রন্ট প্রার্থী ২টি আসনে জয়লাভ করেছে এবং ৬৫টি আসন বিজেপিকে টপকে ২য় স্থান পেয়েছে, অল্প ব্যবধানে কয়েকটি আসনে পরাজিত হয়েছে।

বিজেপি-তৃণমূল মেরুকরণের প্রচারকে কার্যত অকেজো করে নির্বাচকমণ্ডলীর রায়ে ১১.৮৯ শতাংশ ভোট পেয়েছে বামফ্রন্ট। বেশ কিছু বুথ এলাকায় বামফ্রন্টের নেতা, কর্মী ও বহু সাধারণ মানুষ শিরদাঁড়া উঁচু রেখে প্রতিবাদ করেছেন—বাধা দিয়েছেন—মার খেয়েছেন তৎসত্ত্বেও নাস্ত দায়িত্ব সাহসের সঙ্গে পালন করেছেন। বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে তাঁদের এবং নির্বাচকমণ্ডলীকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বামফ্রন্ট প্রার্থীসহ কর্মী, সংগঠকদের উপর শাসক দলের দুষ্কৃতিদের হামলারও নিন্দা করা হয়েছে। নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর শাসক দলের পক্ষ থেকে বামফ্রন্টের দলীয় ও গণসংগঠনের অফিস ভাঙচুর ও জবর দখলের ঘটনারও ধিক্কার জানানো হয়েছে।

নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ করার দাবিতে বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে কয়েক দফায় রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। সাম্প্রতিককালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলির মতো এবারেও নির্বাচন কমিশন অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। নির্বাচনের পদ্ধতিগত ত্রুটি মারাত্মকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। নির্বাচনের দিন এবং গণনার দিনের মধ্যে সব সময় সম্ভাব্য পুনর্নির্বাচনের জন্য একটি অতিরিক্ত দিন না রেখেই গণনার দিন ঘোষণা করা হয়েছিল। অর্থাৎ পুনর্নির্বাচন করা হবে না এটা কমিশন আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিল। বামফ্রন্টের পক্ষ থেকেকলকাতা কর্পোরেশনের প্রহসনের নির্বাচনের বিরুদ্ধে রাজ্যব্যাপী বিক্ষোভ সংগঠিত করা হয়েছে।

২। ভোটার তালিকা সংশোধনের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বারে বারে বলা সত্ত্বেও ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে গাফিলতি পরিলক্ষিত হয়েছে। মৃত বা স্থানান্তরিত ভোটারদের সম্পর্কে বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্ক্রুটিনী করার ক্ষেত্রে দুর্বলতা থাকার ফলে কলকাতা পৌর নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস এই সমস্ত মৃত বা স্থানান্তরিত ভোটারদের নামে ছাপ্পা ভোট দিতে পেরেছে।

৩। ২২ ডিসেম্বর, বুধবার রাজ্য সরকারের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর থেকে অতিরিক্ত সচিব রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে ৫টি কর্পোরেশন সহ অন্যান্য ১০৯টি পুরসভা ও নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটিগুলির বকেয়া নির্বাচনের সম্ভাব্য তারিখ যথাক্রমে ২২ জানুয়ারি, ২০২২ এবং ২৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন। ২৩ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার একই তারিখ আদালতেও উল্লেখিত হয়েছে।

অন্যান্য বছরের মতো ভারতের নির্বাচন কমিশন ১লা জানুয়ারিকে ভিত্তি করে আগামী ৫ জানুয়ারি, ২০২২ সংশোধিত সচিত্র ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে। তারপর ৭ দিন Appellate Authority-র কাছে আবেদন জানানোর সুযোগ থাকে। রাজ্য নির্বাচন কমিশন পৌর নির্বাচনের জন্য ওয়ার্ড ভিত্তিক এই নতুন ভোটার তালিকা গ্রহণ (Adopt) করে। যদি ৫ জানুয়ারির আগে নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় অর্থাৎ, মনোনয়নপত্র দেওয়া শুরু হয়ে যায় তাহলে নতুন ভোটাররা এই নির্বাচনে ভোটদানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন। এইসব ঘোষণার দ্বারা নতুন ভোটারদের ভোটদানের সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে।

এই বিষয়গুলি নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে ডেপুটেশন দেওয়া হবে।

৪। এই ধরনের পরিস্থিতি থাকলেও নির্বাচনের জন্য আমাদের সব রকমের আগাম প্রস্তুতি নিতে হবে। নির্বাচনের জন্য জেলা বামফ্রন্টের নেতা ও কর্মীদের প্রয়োজনীয় কাজ করতে হবে। এই কাজের মধ্যে যেন কোন দুর্বলতা না থাকে তা অবশ্যই জেলা বামফ্রন্টের শরিক দলের নেতৃত্বকে দায়িত্ব নিতে হবে।

৫। বাস্তবতার নিরিখে যেখানে আমাদের বামপন্থীদের গণভিত্তি ও সাংগঠনিক শক্তি দুর্বল বা খুব কম সেখানে প্রার্থী দিতেই হবে—এই মনোভাব থাকা সঠিক নয়। বাস্তব পরিস্থিতি উপলব্ধি করে প্রার্থী দেওয়া এবং প্রার্থী বাছাই করতে হবে। কোন শরিক দল কোন আসনে প্রার্থী দেবে তা রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে জেলা বামফ্রন্টকেই যৌথভাবে ঠিক করতে হবে। বামফ্রন্ট প্রার্থীকে জয়ী করা এবং বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীকে পরাজিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ জেলা বামফ্রন্টকে গ্রহণ করতে হবে।

জেলা বামফ্রন্টের আহ্বায়ক ও শরিক দলগুলির নেতৃত্বকে জরুরী ভিত্তিতে বামফ্রন্টের সভা করে আগামী পৌর নির্বাচনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

Printed and published by Manoj Bhattacharya from Kranti Press, 37 Ripon Street, Kolkata-700 016, Editor : Manoj Bhattacharya of behalf of RSP (Website : www.ganavarta.com)
Price Rs. 2/-